এ যুগের

কিশোর বিজ্ঞানী

ফেব্রুয়ারী - এপ্রিল ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

এ যুগের

কিশোর বিজ্ঞানী

ফেব্রুয়ারী - এপ্রিল ১৯৯৮

সম্পাদক ○ শ্যামল চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক ○ দীপা সরকার

সম্পাদকমণ্ডলী ○ শংকর চক্রবর্তী, জীবন সর্দার, নিমাই দত্তগুপ্ত, অরুণাভ মিশ্র, অলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, জয়ন্ত দাস

প্রচ্ছদ ○ শিবশংকর ভট্টাচার্য

অলংকরণ ○ তপন দে

লেজার টাইপিং ○ শৈলী
ও 8এ, মানিকতলা মেইন রোড
মুদ্রণ কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

মূল্য ○ ১২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে শ্রীদীপ ভট্টাচার্য কর্তৃক হেমন্ত বসু ভবন (৪র্থ তল), ১২, বি. বা. দি. বাগ, কলিকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত।

স ম্পা দ কী য়

সবাইতো এর মধ্যে নতুন ক্লাশে উঠে গিয়েছো। নতুন বই খাতার কেমন একটা ভালো লাগা গন্ধ থাকে। মলাট দিয়ে যত্ন করে রাখতে হয় সব। অনেকে আবার দাদা দিদিদের পড়া পুরোনো বই-ই যত্ন করে তৈরি করে নিয়েছো নিশ্চয়ই।

পুরোনো বই না নতুন বই — কথাটা খুব বড়ো নয়। আসল কথা হল, পড়ে নিতে হবে আমাদের। বুঝে নিতে হবে।

বসন্ত আর বর্ষার মাঝে দু'চার দিন আমাদের কাছে মাঝে মাঝে খারাপ খবর হয়ে দেখা দেয়। মেদিনীপুরে চোখের নিমেষে নেমে এসেছিল 'টর্নেডো'। গুড়িয়ে দিয়েছে অনেকের ঘর বাড়ি পশু। জীবন দিয়েছেন বেশ ক'জন।

দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকেই। মেদিনীপুর জেলার বিজ্ঞান মঞ্চের বন্ধুরাও সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। বিজ্ঞান এখন অনেক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনারই আগাম খবর দিতে পারে। এ বিষয়ে আরও বেশি নজর রাখতে হবে আমাদের-ই।

রাগ আর দুঃখের খবরও কম কিছু নেই আমাদের জন্য। কাগজে দেখেছো তোমরা, আমাদের দেশের চাল 'বাসমতী' আমেরিকার বাজারে অন্য নামে বিক্রি হচ্ছে। কেনা বেচায় আপত্তি কিছু নেই আমাদের। কিন্তু আমেরিকার এক কোম্পানি বলতে চাইছে, এই চালের মালিকানা ওদের-ই। আমাদের দেশের 'বাসমতী'র সাথে নাকি কোন সম্পর্কই নেই !

সোচ্চার প্রতিবাদ করছি আমরা। এই প্রতিবাদে তোমাদেরও পাশে পেতে চাই। আমাদের দেশ মামলা করেছে যদিও শুরুর কাজটা বড্ড দেরিতে হয়েছে।

শুভেচ্ছা নিও। ভালো থেকো সবাই।

সূচীপত্র

আকাশ চেনার হরেক মজা / বাসুদেব ভট্টাচার্য / ৭

লোকটি প্রথমে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আকাশে কি-যেন একটা খুঁজছে। তারপর চোখটাকে চিনতে-পারা জায়গাটা থেকে সরিয়ে একটা তারার দিকে তাকিয়ে বলবে, ঐটা। তুমি অবাক হয়ে ভাববে, কি আশ্চর্য ! তারাটাতো তেমন উজ্জ্বল নয়, তা'হলে লোকটা চিনল কী করে ? এটাই তো মজা ! তারাগুলির গায়ে তো আর নাম লেখা থাকে না, যে, দেখে বুঝবে কোন্‌টা কোন্ তারা বা গ্রহ ! তারা চেনা যায় তার সঙ্গীদের দেখে . . . . .

এস. এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিকসায়েন্সেস / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১

কলকাতাতেও একই ভাবে বেসিক সায়েন্স বা মৌল বিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছে অনেক দিন থেকেই। এ বিষয়ে পথিকৃৎ অবশ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। তার পরেই যে সংস্থাটি এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার, 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র' বা 'S. N. Bose National Centre for Basic Sciences'। শুধুমাত্র মৌল বিজ্ঞান চর্চা এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিয়ত যে বিজ্ঞান গবেষণা চলেছে তার সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখার জন্যই এই গবেষণা কেন্দ্রটির সূচনা। একেবারে শৈশবাবস্থায় এই কেন্দ্রটির ঠিকানা ছিল IACS এর একটি ছোট্ট ঘরে।

. . . . করে কত রঙ্গ / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার / ১৪

আট থেকে আশি — সব বয়েসের মানুষের কাছে পরিচিত ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। তিনি তাঁর সৃষ্টির ডালি উজাড় করে দিয়েছেন তেমাদের জন্যে। আরও দেবেন আগামী সব সংখ্যায় . . . . .

কিংবদন্তির নায়ক সাপ / রক্তিম দাশ / ১৭

শুধু বই পড়া বিদ্যে নয়, সাপ নিয়ে খেলা দেখান হামেশাই। এখানে ওখানে। বিজ্ঞান মঞ্চের নিবিড় কর্মী একজন। ভয় ভেঙ্গে দেবার কতো কথা রয়েছে এই লেখায় . . . .

সকাল থেকে শুরু / জয়ন্ত দাস / ২১

চায়ের ফ্লুরাইড দাঁতের এনামেলকে মজবুত করে। তাছাড়া বেশ কিছু ওরাল ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলে মাড়িকেও সুরক্ষিত রাখে এই চা। আবার ক্লিভল্যাণ্ড ও ওহিয়োর একদল গবেষক ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন যে সবুজ চায়ের ক্যাথেগিন নামক রাসায়নিকটি ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে ত্বক ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে। চায়ের এত গুণপনা শুনে যারা ইতিমধ্যেই এককাপ চা শেষ করে আরেক কাপের অর্ডার দিয়ে ফেলেছো তাদের জানাই অতিরিক্ত চা পান কিন্তু মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

অমলতাস / শৈবাল কুমার গুহ / ২৩

আমাদের দেশ ধনধান্যে পুষ্পে ভরা। ভেষজ উদ্ভিদের সেরা সংগ্রহ। মিষ্টি নাম অমলতাস। কাকে নিয়ে নানা কথা এ লেখায়। জমকালো ফুলের জন্যেই অমলতাসের কদর। তাছাড়া এর কাঠও শক্ত দীর্ঘস্থায়ী। পাহাড়ী লোকেরা এর ফুল সব্জি হিসাবে খেয়ে থাকে, আর জ্বরে ওষুধ ও টনিকের জন্যে ব্যবহৃত হয় গাছের শিকড়।

ঘুম নিয়ে ভাবনা / রণতোষ চক্রবর্তী / ২৪

বাংলায় সুপরিচিত বিজ্ঞান লেখক রণতোষ চক্রবর্তী। তাঁর এই লেখাতেই রয়েছে . . . . অজানা অতীতের পুরাণ উপাখ্যানে ঘুমের কথা কে না জানে ? সেই যুগে মুচকুন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তিনি নাকি একবার দেবতাদের খুব খুশি করেছিলেন। বিনিময়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি নাকি নিশ্চিন্তে বহুদিন ঘুমোবার বর চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি ঘুমিয়ে চলেছেন।

বজ্রকীট / প্রদীপ ঘোষ / ২৬

এই রচনাটি যাঁর, তিনি আজ বেঁচে নেই। একদল গুণ্ডা এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীকে কয়েকবছর আগে হত্যা করেছে। মৃত্যুত্তীর্ন এক অসাধারণ রচনা 'বজ্রকীট' বিস্ময়কর রকমের দক্ষ শৈলী এই রচনায় . . . . . "এ আপনার কেমন পোকা মশাই ? কামড়ে হাড় ছেঁদা করে দেয় এমন তো শুনিনি কখনও ! এক মহাভারতে আছে, কর্ণের কোলে মাথা রেখে যখন পরশুরাম ঘুমোচ্ছিলেন, তখন এক বজ্রকীট কর্ণের থাইয়ের মাস্‌ল্ আর ফিমারের হাড় ছেঁদা করে বেরিয়ে এসেছিল," ডাক্তার আগের দিনের ড্রেসিং বদলে শক্ত করে নতুন ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কথা বলছিলেন, "আপনার এই পোকা মনে হচ্ছে সেই বজ্রকীট।"

ম্যালেরিয়ার শত্রু সন্ধান / সৃঞ্জয় গুপ্ত / ৩১

তরুণ এই লেখকের বিজ্ঞান নিবন্ধ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচুর তথ্য সাজিয়ে তাঁর এই রচনা। সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রতিষেধক হিসাবে যে ওষুধটি সাড়া জাগিয়েছিল তা কোনো ল্যাবরেটরিতে তৈরী হয়নি। তা ছিল সম্পূর্ণ উদ্ভিদজাত। অর্থাৎ ভেষজ। সেটি ছিল সিঙ্কোনা গাছের ছালের রস। এমনকি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই ভেষজই ছিল ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। পরবর্তীকালে অবশ্য এর অনুকরণে ম্যালেরিয়ার অনেক ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে।

জোড়া ছড়া / অরুণাভ মিশ্র / ৩৫

মজা আর বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আর মজা। সার্থক যুগলবন্দী না হলে ছড়া নীরস রকমের হাস্যকর হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি 'মেলানো যায়' . . . .

রঙ চঙে বিপদ / অসীম বসাক / ৩৬

এ আবার কেমন হুঁশিয়ারি ?! রংকেও ভয় পাব ! থুড়ি ভয় পেতে হবে। তাহলে প্রজাপতির রঙিন নাচ, নীল আকাশের বুকে রামধনুর সেতু, গোধূলির সোনালির সীমান্তে সিঁদুরে হরিয়ালী, শরতের সাদা মেঘ, কালবৈশাখীর বজ্রকালো ঝড়, নিকষকালো আকাশের বুকে নক্ষত্রের পরশমনি গুনব কি করে ? কখনও ত শুনিনি এমন ! রংকে ভয় পেতে হবে ! হবে হবে। এবার থেকে হবে।

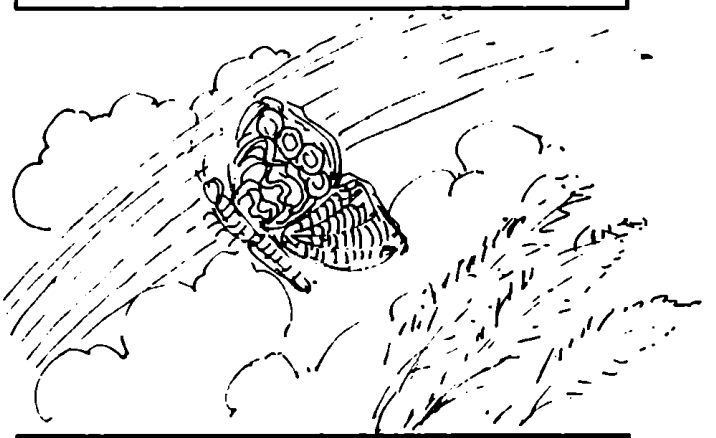

আমাদের তারা সূর্য / অলোকমোহন চট্টোপাধ্যায় / ৩৮

লেখাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। তার সার্থক দৃষ্টান্ত এই লেখক। মহাকাশ নিয়ে তাঁর লেখা লেখি অগুণতি। সূর্য আর তারার কথা কখনো পুরনো হয়না আমাদের। হিলিয়াম ভারী গ্যাস বলে এটা সূর্যের কেন্দ্রে চলে যায়। হাইড্রোজেনটা বাইরের দিকে চলে যায়।,সেখানেও উষ্ণতা বেশি থাকে বলে ফিউসান হয়েই চলে। কিন্তু যখন ফিউসান অনেকটা এগিয়ে যাবে, তখন আমাদের তারা (সূর্য) আর হাইড্রোজেন ফিউসান করতে পারবে না।

সংখ্যা এল কেমন করে / গোপাল চক্রবর্তী / ৪০

কট্টর জড়বাদী দার্শনিক দিদেরো একবার রাশিয়ায় জারের সভায় গিয়ে তখনকার রাশিয়ান পণ্ডিত সমাজকে যখন নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে, সেই সময়ে আস্তিক পণ্ডিত সমাজকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত গণিতবিদ অয়লার। তিনি দিদেরোকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। দিদেরোর প্রচণ্ড আস্থা নিজের যুক্তি তর্কের ওপর। তাই তিনি সানন্দে গ্রহ করলেন অয়লার-এর আহ্বান। অয়লার এলেন এবং প্রথমেই দিদেরো-কে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরভাবে বললেন . . . . .

মৌলিক পদার্থের খুঁটিনাটি / অসীম কুমার হালদার / ৪৬

ছোট্ট দু'পাতার লেখা। মৌলের এক বড়ো জগত ধরা রয়েছে। পরিশ্রমসাধ্য এই সারণী আমাদের তরুণ বন্ধুদের সব সময়ে কাজে লাগবে।

বিজ্ঞানের খবরাখবর / দীপা সরকার / ৪৮

আধুনিক এই পৃথিবীতে বিজ্ঞানের হয়ে চলেছে নিত্য নতুন আবিষ্কার। তার ছিটেফোঁটা লিখলেও পাতার পর পাতা ভরে ওঠে। আকর্ষনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করে লেখিকা সাজিয়েছেন নিয়মিত এই বিভাগ।

সবুজ পাতা / ৫০

অমি'দার 'আলাপন' দিয়ে শুরু। প্রকৃতি পড়ুয়া পরমা ঘোষ মজুমদার লিখেছে 'চাঁপাপুকুর সফর কাহিনী।' বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অনাদি নাথ দাঁ দিয়েছেন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর। তিন তিনটি ছড়া বন্ধুদের। বাদল মান্না (১০), মেঘনা নন্দী (১২) আর তিয়াস দত্ত (১৫)। 'খেলতে খেলতে' শুরু করেছেন এই বিষয়ের দক্ষ মানুষ অমিত মুখোপাধ্যায়। ছ'পাতা জুড়ে রঙ বেরঙের মজাদার সমারোহ . . . . .

শব্দ সিঁড়ি / ৫৬

আগেরটার উত্তর অনেকেই দিয়েছো। আমরা এখানে সবার জন্যে দিয়ে দিলাম। সাথে রইল আরও একটি নতুন শব্দের সিঁড়ি।

আকাশ চেনার হরেক মজা

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য

আকাশ কেন দেখি

আচ্ছা, আমরা আকাশ দেখি কেন ?

এর উত্তর দেবার আগে একটা পাল্টা প্রশ্ন করি, তোমরা টিভি দেখো কেন ?

তুমি বলবে, কেন আবার, আনন্দ পাই দেখে, তাই ! টিভিতে কত নাচ-গান, হাসি-কৌতুক, খেলা-ধূলা আর সিনেমা থাকে !

আমরাও তো আকাশ দেখি একই কারণে — আনন্দ পাই বলে !

তুমি যদি গ্রামে থাকো তো কথাই নেই ; আর যদি শহরে থাকো তো চলে এসো শহরের আলোর উৎপাত থেকে দূরে একটু গ্রামের দিকে, অমাবস্যার কাছাকাছি কোন সন্ধ্যায়। একটা খোলা জায়গায় এসে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। দেখবে, আকাশের নিকষ কালো চাঁদোয়ার বুকে অজস্র চুম্‌কি আর হিরের মতো ছোট বড় অসংখ্য তারার মেলা। কত যে তাদের রঙ-বাহার ! আর ঐ তারায় ভরা আকাশের বুক চিরে চলে গেছে উজ্জ্বল সাদা ধোঁয়াটে ছায়াপথ — আকাশ গঙ্গা। যদি আকাশটা তোমার চেনা থাকে তবে কল্পনার রথে চড়ে ঐ ছায়াপথে দক্ষিণের ধনুরাশি থেকে যাত্রা শুরু করে শ্যেনমণ্ডল (Aquila), হংসমণ্ডল (Cygnus), হয়ে উত্তরে সেফিউস্ (Cepheus), ক্যাসিওপিয়া আর পারসিউস্ (Perseus) ঘুরে, আবার দক্ষিণে নেমে কালপুরুষকে সাক্ষাত করবে। তারপর আরও দক্ষিণে ভেলা (Vela)-য় চড়ে সেণ্টোরাস্ (Centaurus)-এর উপর দিয়ে আকাশে শুয়ে থাকা বিশাল কাঁকড়া বিছে (বৃশ্চিক রাশি)-টার লেজ মাড়িয়ে আবার চলে আসবে ধনু রাশিতে। আর এই চলার পথে (বাইনোকুলার বা টেলিস্কোপ দিয়ে) ছায়াপথের আশে-পাশে এবং নানা দিকে দেখতে পাবে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা অজস্র তারার ঝাঁক(Star Cluster), নেবুলা (Nebula), আর নক্ষত্র জগৎ (galaxy)। আছে আরও কত বিচিত্র বস্তু ! আর এদের সাথে জড়িয়ে আছে কত না রহস্য ! এই সব বিচিত্র বস্তু, গ্রহ, উপগ্রহ দেখার মধ্যে আর তাদের রহস্যকে জানার মধ্যে আছে এক অপরিসীম আনন্দ। সে আনন্দ আর মজার কোন তুলনা নেই। এর জন্য চাই শুধু দুটি কৌতূহলী চোখ, আর সৌন্দর্য ও মজা উপলব্ধি করার মতো মন। আর চেনা থাকা চাই আকাশটা।

কিন্তু তোমার যদি আকাশটা চেনা না থাকে তবে তুমি শুধু ব্যাজার মুখ করে বসে থাকবে। ভাববে, আকাশের সব তারাই তো দেখতে একই রকম ! যেমন আমরা ভাবি, সব চীনা-ই দেখতে একরকম।

ঐখানেই হ'ল মুশকিল, আর সেই মুশকিল আসানেই হ'ল আকাশ চেনার মজা।

আমি অনেক ছেলে মেয়েকেই রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, বলতো ধ্রুবতারা কোন্‌টা ? আর ওরা আকাশের উজ্জ্বল তারাগুলির দিকে তাকিয়ে যার যেটা পছন্দ হয়েছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। শুনে, যারা আকাশ চেনে, তারা হো হো করে হেসে উঠেছে। এবার তুমি যদি উল্টোটা করো, অর্থাৎ আকাশ চেনে — এমন একজনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাত্রে জিজ্ঞেস করো, ধ্রুবতারা কোনটা ? দেখবে, লোকটি প্রথমে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আকাশে কি-যেন একটা খুঁজছে। তারপর চোখটাকে চিনতে-পারা জায়গাটা থেকে সরিয়ে একটা তারার দিকে তাকিয়ে বলবে, ঐটা। তুমি অবাক হয়ে ভাববে, কি আশ্চর্য ! তারাটাতো তেমন উজ্জ্বল নয়, তা'হলে লোকটা চিনল কী করে ? এটাই তো মজা ! তারাগুলির গায়ে তো আর নাম লেখা থাকে না, যে, দেখে বুঝবে কোন্‌টা কোন্ তারা বা গ্রহ ! তারা চেনা

যায় তার সঙ্গীদের দেখে, অর্থাৎ তারামণ্ডল দেখে, কিংবা আশে-পাশের অন্যান্য উজ্জ্বল তারাগুলি দেখে। তারামণ্ডল বা নক্ষত্রমণ্ডল (constellation) কী, তা' নিশ্চয়ই এর মধ্যে জেনে ফেলেছো ? আকাশে কোন বস্তুর অবস্থান সহজে নির্ণয় করার জন্য সারা আকাশটাকে ৮৮টা ছোট-বড় এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। আর প্রত্যেক এলাকার বিশিষ্ট কিছু তারাকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করে এক একটা আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। এদেরই বলে তারা মণ্ডল বা নক্ষত্র মণ্ডল (constellation)। আর ঐ বিভিন্ন আকৃতি অনুসারে তাদের নাম হয়েছে সপ্তর্ষি মণ্ডল, কালপুরুষ, ক্যাসিওপিয়া, বৃশ্চিক রাশি, ধনু রাশি ইত্যাদি। যেমন বিচিত্র তাদের নাম, তেমনি বিচিত্র এদের আকৃতি। নাম গুলোর অনেকেরই পিছনে জুড়ে আছে বিভিন্ন (গ্রীক ও ভারতীয়) পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু সে কথা এখন থাক। বরং এসো আমরা আকাশ চেনা শুরু করি।

আকাশ চেনা শুরু করো

সত্যি কথা বলতে কী, আকাশ চেনা একটা গুরুমুখী বিদ্যা। ছোট্ট শিশুকে অ আ ক খ শেখাবার জন্য যেমন একটা বর্ণ পরিচয়ের বই এবং বর্ণ গুলিকে আঙুল দিয়ে ধরে ধরে চিনিয়ে দেবার জন্য কারও সাহায্য দরকার হয়,

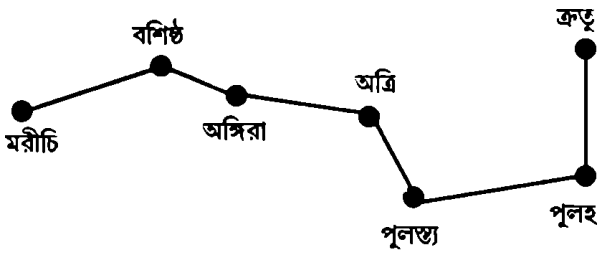

সপ্তর্ষিমণ্ডল

তেমনি আকাশ চেনা শুরু করার জন্য (যদি সত্যি সত্যি চিনতে চাও) চাই একটা স্টার চার্ট বা আকাশের মানচিত্র, এবং এমন একজন ব্যক্তি যিনি আকাশ চেনেন, কিংবা সবটা না চিনলেও অন্ততঃ কিছু তারামণ্ডল চেনেন। ইনিই হবেন তোমার প্রথম গুরু। তা' তিনি তোমার বন্ধুই হোক, কিংবা অন্য কেউই হোন। আকাশের তারামণ্ডলগুলোর

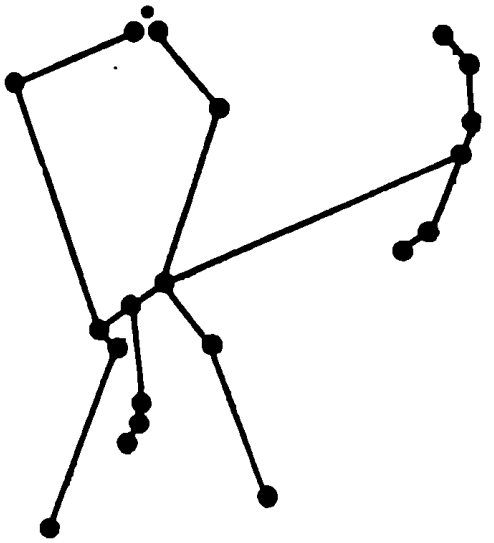

কালপুরুষ

মধ্যে চারটে তারামণ্ডল অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং এগুলো চেনা অত্যন্ত সহজ। আর, এগুলি একবার চিনে নিলে আর কোনদিন চিনতে ভুল হবে না। এই চারটে হ'ল সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ক্যাসিওপিয়া এবং বৃশ্চিক রাশি। আর, দিক ঠিক করার জন্য তোমাকে চিনতে হবে ধ্রুবতারা (উত্তর দিকে)।

বছরের যে-কোন দিন এবং রাতের যে-কোন সময় আকাশে একটু খুঁজলে তুমি হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল, না হয় ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাবে। মার্চ-এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার আকাশে উত্তর দিকে বেশ উঁচুতে পাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে সাতটি তারা, অনেকটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। বেশ উজ্জ্বল। এদের নাম যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং মরীচি। এদের মধ্যে প্রথম চারটি তারা মিলে তৈরী হয়েছে একটা চতুর্ভুজ, অনেকটা ট্রাপিজিয়ামের মতো ; আর বাকি তিনটে দিয়ে তৈরী হয়েছে লেজ। আবার তৃতীয়, চতুর্থ এবং বাকি তিনটে তারা মিলে অনেকটা বৃত্ত-চাপের মতো তৈরী হয়েছে। ঐ বৃত্তচাপটাকে মনে মনে দক্ষিণ-পুব দিকে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিলে তুমি একটা উজ্জ্বল হলুদ-কমলা রঙের তারা দেখতে পাবে। ওটা হ'ল স্বাতী (Arcturus) নক্ষত্র। আবার স্বাতী ছাড়িয়ে বাঁকটাকে আরও দক্ষিণে ঘোরালে তুমি পেয়ে যাবে উজ্জ্বল চিত্রা

ক্যাসিওপিয়া

(spica) নক্ষত্রকে। এবার, চলে এসো সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাথার দিকে। মাথার প্রথম দুটো তারাকে যোগ করে দ্বিতীয় থেকে প্রথমটির দিকে, অর্থাৎ পুলহ থেকে ক্রতুর দিকে বাড়িয়ে দিলে কিছুটা দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা মোটামুটি উজ্জ্বল তারা তোমার নজরে পড়বে। তারাটা খুব উজ্জ্বল নয়, অনেকটা সপ্তর্ষির তারাগুলোরই মতো, কিন্তু ঐ এলাকায় আশে পাশে ঐ রকম উজ্জ্বল তারা আর নেই। ওটাই হ'লো ধ্রুবতারা। কাজেই পেয়ে গেলে সঠিক উত্তর দিক। বাকি দিকগুলি চিনতে আর অসুবিধে নেই।

ফেব্রুয়ারীর শেষ বা মার্চের প্রথম দিকে, দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চোখটা ক্রমশঃ মাঝ আকাশের দিকে আনলেই তোমার নজরে পড়বে কালপুরুষকে। রাত কিংবা মাস এগোনোর সাথে সাথে অন্য সব তারা মণ্ডলের মতোই এটা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হেলে পড়বে। কালপুরুষের প্রথমেই যেটা নজরে পড়বে তা'হল ওর কোমরের 'বেল্ট'-এর তিনটে তারা। পুব-পশ্চিম বরাবর, সমান দূরত্বে, সমান উজ্জ্বল তিনটে তারা। বেল্ট থেকে উত্তর দিকে চোখ সরালে একটু দূরে পুবে একটা এবং পশ্চিমে একটা উজ্জ্বল তারা নজরে পড়বে। পুবের তারাটা (ডান কাঁধ) বেশি উজ্জ্বল এবং বেশ লালচে, এটা আর্দ্রা নক্ষত্র (Betalguse)। পশ্চিমের তারাটা একটু কম উজ্জ্বল, এটা বাঁ-কাঁধ (Bellatrix)। এদের মাঝে সামান্য উত্তরে অনুজ্জ্বল মাথাটা। কোমর থেকে দক্ষিণ দিকে তিনটে তারা দিয়ে ঝোলানো তরবারি। আরও দক্ষিণে, পুবে এবং পশ্চিমে দুটো তারা হ'লো ডান ও বাঁ পা। পশ্চিমেরটা বেশী উজ্জ্বল ও সাদা ; ওটা বানরাজা (Rigel)। আকাশ পরিষ্কার এবং অন্ধকার থাকলে কালপুরুষের হাতে পশ্চিম দিকে অনেকগুলো ছোটছোট (অনুজ্জ্বল) তারা দিয়ে তৈরী বাঁকানো ধনুকটিও দেখতে পাবে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তর-পশ্চিম কোণে অস্ত যেতে না যেতেই উত্তর-পুব কোণে ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাবে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, সন্ধ্যায় সোজা উত্তর দিকে বেশ উঁচুতে খানিকটা ছ্যাৎরানো 'M' অক্ষরের মতো দেখতে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। স্কুলের ভূগোলের বইয়ে বা অন্য অনেক বইয়ে "একে 'M' বা 'W' অক্ষরের মতো দেখতে" এরূপ লেখা থাকে — কেননা সাহেবদের বইতে তা-ই লেখা। সাহেবদের দেশে ক্যাসিওপিয়া অস্ত যায় না। যখন এটা ধ্রুবতারার উপর দিকে থাকে তখন দেখতে M-এর মতো হয় (যেমন আমরা দেখি), আবার যখন ঘুরে ধ্রুবতারার নিচে চলে যায় (আমাদের দেশে অস্ত চলে যায়) তখন W-এর মতো দেখতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শুধু M - অক্ষরের মতোই দেখি — কখনো সোজা কখনো পুবে বা পশ্চিমে হেলানো অবস্থায়। ক্যাসিওপিয়ার (M-এর) পেটের খাঁজ এবং ডানদিকের

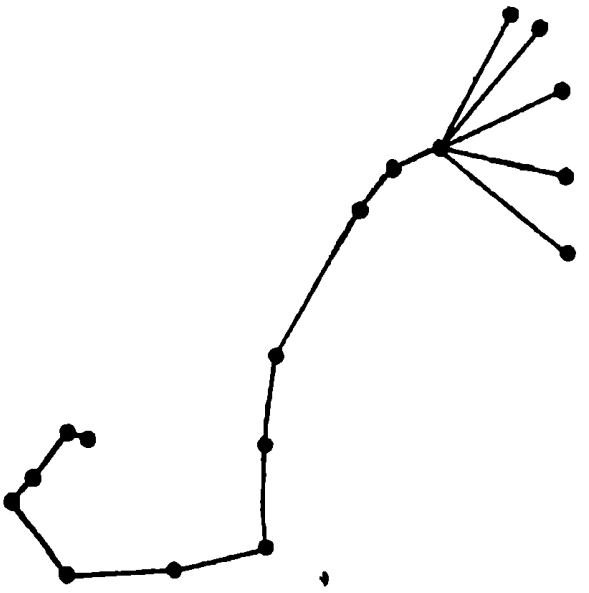

বৃশ্চিক রাশি

চুড়ো - এই দুটো তারা যোগ করে সমদ্বিখণ্ডিক টানলে সেটা উত্তর দিকে ধ্রুবতারার কাছ দিয়ে যায়।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আকাশ পরিষ্কার থাকলে সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিকে দেখতে পাবে বৃশ্চিক রাশিকে — হুবহু একটা বিশাল কাঁকড়া বিছের মতো। ভুল হবার কোন উপায় নেই। এই চারটে (নিদেনপক্ষে দুটো) তারামণ্ডল চেনা হলে বাকি সব নিজেই চিনে নিতে পারবে স্টার চার্ট-এর সাহায্যে এবং চার্ট দেখার পদ্ধতি জেনে। সেক্ষেত্রেও তোমার চেনাটা সঠিক হ'লো কিনা তা' নিশ্চিতভাবে জানার জন্য একজন আকাশ বিশেষজ্ঞের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। আর তাঁর কাছেই সন্ধান পেয়ে যাবে আকাশের অজস্র রহস্যময় বস্তুর ঠিকানা। তার জন্য অনেক বইও অবশ্য আছে। তখনই তোমার প্রয়োজন হবে বাইনোকুলার কিংবা টেলিস্কোপের ; এবং জানা প্রয়োজন হবে তাদের ব্যবহার পদ্ধতি।

আকাশ সম্পর্কিত অনেক বইতেই স্টার-চার্ট পাবে এবং প্রথম শুরু করার মতো কোন সাহায্যকারীও হয়তো পেয়ে যাবে।

আমাদের সবার খুশির খবর

নিজস্ব ভবন তৈরি হচ্ছে আমাদের

'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'-এর নিজস্ব ভবন

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সবাই

তোমারা-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন ?

কতো দিতে পারলে, বড়ো কথা নয়

সাধ্যমতো দিয়েছো, এইটাই আসল কথা

জেলায় বিজ্ঞান মঞ্চের আপিসে দিতে পারো

সরাসরি পাঠাতে পারো এই ঠিকানাতেও

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

হেমন্ত বসু ভবন (৪র্থ তল)

১২, বি. বা. দি. বাগ

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মৌল বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী

এস. এন. বোস ন্যাশনাল সেণ্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষণা মূলত দু'রকমের। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। দ্বিতীয়টির বেলা ফল পাওয়া যায় দ্রুত। তারপর সেই ফল কাজে লাগিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করা যায়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অকল্যাণকর কাজও হয়। তবে তার সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু প্রথমটিতে অর্থাৎ তাত্ত্বিক গবেষণায় চট জলদি কোন ফল পাওয়া যায় না। যদিও তাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ ফলের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে নানা ধরনের প্রায়োগিক গবেষণা করা সম্ভব। কিছুদিন আগে সারা বিশ্ব জুড়ে একটা দাবি উঠেছিল, শুধু গবেষণার জন্যই গবেষণা করে কোন লাভ নেই। এতে সময়, অর্থ, পরিশ্রম সবই নষ্ট হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ দাবি ধোপে টেকেনি। ফলে বিশ্ব জুড়ে তাত্ত্বিক গবেষণা যেমন চলার তেমনই চলেছে।

কলকাতাতেও একই ভাবে বেসিক সায়েন্স বা মৌল বিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছে অনেক দিন থেকেই। এ বিষয়ে পথিকৃৎ অবশ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। তার পরেই যে সংস্থাটি এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার নাম, 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র' বা 'S. N. Bose National Centre for Basic Sciences'। শুধুমাত্র মৌল বিজ্ঞান চর্চা এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিয়ত যে বিজ্ঞান গবেষণা চলেছে তার সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখার জন্যই এই গবেষণা কেন্দ্রটির সূচনা। একেবারে শৈশবাবস্থায় এই কেন্দ্রটির ঠিকানা ছিল যাদবপুরের IACS এর একটি ছোট্ট ঘরে। গুটিকয় কর্মী আর গবেষক নিয়ে আটের দশকের মাঝামাঝি এর যাত্রা শুরু। তারপর শৈশব থেকে বাল্যে পা রাখতেই দেখা গেল IACS-এর এক চিলতে ঘরে আর কুলোচ্ছে না। খোঁজ পড়ল আরও বড় জায়গার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জায়গা পাওয়া গেল লবণ হ্রদ বা সল্ট লেক এর এক নং সেক্টারের ডি বি ব্লকে। অস্থায়ীভাবে ভাড়া বাড়িতে মৌল বিজ্ঞান চর্চায় মেতে উঠলেন তরুণ বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ চঞ্চল কুমার মজুমদার এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম অধিকর্তা হিসাবে যোগ (১৯৮৭-র মাঝামাঝি) দিয়েছেন।

ডঃ মজুমদারের সুদক্ষ নেতৃত্বে এরপর গবেষণার কাজে যেমন জোয়ার এল, তেমনি ইন্সটিটিউটের নিজস্ব বাড়ির জন্যও ভাবনা চিন্তা শুরু হল। শেষ পর্যন্ত জমি পাওয়া গেল সল্ট লেকেরই তিন নং সেক্টারের জে ডি ব্লকে। মোট জমির অর্ধেক পঃ বঃ সরকার ইন্সটিটিউটকে দান করল। বাকীটা সংস্থা তার নিজস্ব টাকায় কিনে নিল। জমি কেনা হতেই শুরু হল বাড়ি তৈরির কাজ। অবশেষে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে এস. এন. বোস জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রের ঠিকানা হল নতুন ক্যামপাসে।

এই গবেষণা সংস্থায় মৌল বিজ্ঞানের যে যে শাখায় তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের চর্চা হয় সেগুলি হল, পদার্থবিদ্যা, গণিত, প্রায়োগিক গণিত (অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিকস), গাণিতিক মডেল তৈরি ও থিয়োরিটিক্যাল কেমিসট্রি। এছাড়া বর্তমানে এই সংস্থায় চালু রিসার্চ প্রজেক্টগুলি হল থিয়োরিটিক্যাল হাই এনার্জি ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিশন অ্যাণ্ড নিউক্লিয়ার স্ট্রাকচার ক্যালকুলেশন, ওয়ার উইক

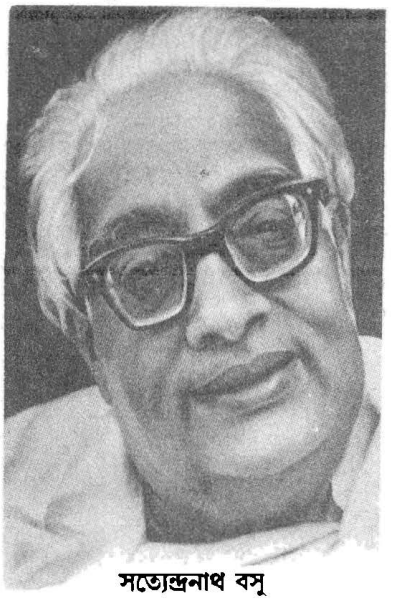

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী, হাই Tc সুপার কনডাকটিভিটি অ্যাণ্ড এক্সটেনশন টু লো টেমপারেচার সুপার কনডাকটিভিটি, স্ট্রাকচার - প্রপার্টি কোরিলেশন ইন দ্য ফেজ ট্রানজিশন অভ মেটালোমেসোজেনস, প্রোবিং- দ্য ফাউনডেশন অফ কোয়াণ্টাম থিওরি প্রভৃতি। এই সব মৌলিক বিষয়ের চর্চায় এই সংস্থাটি দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে একথা বলাই বাহুল্য।

এস. এন. বোস জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রে যেহেতু শুধুমাত্র বেসিক সায়েন্স এর নানা সমস্যা নিয়ে গবেষণা হয়, সেহেতু এখানে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তরুণ বিজ্ঞানীরা অবশ্য এখানে গবেষক হিসাবে কাজে যোগ দিতে পারেন। এজন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা হল, জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত NET অথবা GATE পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তারপর এই সংস্থায় গবেষণা করার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সবশেষে এখানে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সুযোগ পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি বছরের গোড়ায় (জানুয়ারি ১ থেকে ১৬) এস. এন. বোস জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্ব

আছে কি নেই তা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি এই বিষয়ে বিশ্বের সর্ব প্রথম আলোচনা চক্র।

সবশেষে এটুকুই বলা যায়, এই গবেষণা সংস্থাটি বয়সে নিতান্ত নবীন হলেও এর গবেষণার ফল কিন্তু সুদূর প্রসারি। হয়ত আজকেই এদের গবেষণার বিষয় বা গবেষণালব্ধ ফলের তেমন কোন মূল্য নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে ওই ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই হয়ত বিজ্ঞানের নতুন কোন দিগন্ত অন্ধকার থেকে আলোয় উদ্ভাসিত হবে।

কিছু তথ্য এক নজরে

১। এস. এন. বি. এন. সি. বি. এস. ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস। (সত্যেন্দ্রনাথ বোস জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র)

২। ঠিকানা ঃ ব্লক জে ডি, সেক্টর - তিন
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১

৩। বর্তমান অধিকর্তা ঃ অধ্যাপক চঞ্চল কুমার মজুমদার।

৪। মোট জমির পরিমাণ ঃ ১৫ একর

৫। বাৎসরিক বাজেট ঃ ২৬২ লক্ষ প্রায় (১৯৯৬-৯৭)

৬। মোট কর্মী সংখ্যা ঃ ৩৫
(শিক্ষক / অশিক্ষক সহ)

৭। রিসার্চ ফেলো/অ্যাসোসিয়েট ঃ ২৪

৮। বিভাগ ঃ ৫
(ক) ফিজিক্স।
(খ) ম্যাথামেটিকস।
(গ) অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিকস।
(ঘ) ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং।
(ঙ) থিওরেটিক্যাল কেমিস্ট্রি।
(এই বিভাগগুলির আবার বিভিন্ন উপশাখা আছে)

৯। গ্রন্থাগারে মোট বই ঃ ৫০,০০০।

১০। জার্নাল — (বিদেশি গ্রাহক) ২২

১১। ,, — (দেশি গ্রাহক) ১২
,, — (উপহার) ১
(অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল ফ্রম ICTP, Trieste, Italy)

১২। বর্তমান ফোন নং 334-3057.

কীট ও পতঙ্গ . . . . করে কত রঙ্গ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

।। ও জোনাকি, খোঁজো নাকি ।।

জোনাকি - গো ও জোনাকি
আলো জ্বেলে খোঁজো নাকি
খাবার
দাবার
পেলে কিছু ঝোপে-ঝাড়ে
চুপিসাড়ে করো তারে
কাবার
সাবাড়
বুঝে নাও সাঁঝ হলে
সময় যে যায় চলে
আবার
যাবার
খুঁজে নাও উড়ে-উড়ে
জায়গাটা ঘুরে-ঘুরে
খাবার
পাবার

।। প্রজাপতি, সোজা অতি ।।

প্রজাপতি প্রজাপতি
সোজা অতি বোঝা গতি
তোর
ফুলে - ফুলে দুলে - দুলে
যাস্ উড়ে ঢেউ তুলে
জোর
নেচে - গেয়ে মধু খেয়ে
গেলি ধেয়ে সাড়া পেয়ে
চোর
হেসে - খেলে পাখা মেলে
এলি ফের না হতেই
ভোর

।। জোঁক-বিছে লাগে পিছে ।।

জোঁক

বললে ডেকেই শোন্‌রে বিছে
সব কাজেতেই গিলিস্ মিছে

ঢোঁক

বিছে

বললে, স্বভাব বিশ্রী তোমার
সব সময়েই লাগো আমার

পিছে

।। ফড়িং - ডাইন, লড়িং ফাইন ।।

ডাইন ফড়িং ডাইন ফড়িং ডাইন, সত্যি তোরা
রঙটি দেহের সবুজ তোদের ফাইন ! দেখতে খুবই
লম্বা - পায়ে কাঁটা - আঁটা ফাঁদ, শিকার ধরার
'সাপের মাসি' বলেও তোদের বাদ !! দেয় তো অপ-

।। আয় গুবরে, দিয়ে ডুবরে ।।

গুবরে

দেহেতে তোর শক্তি যেমন
গায়েতে বদ গন্ধ তেমন

খুব-রে

গুবরে

তাই বলি ভাই গঙ্গা থেকে
আয় দিয়ে তুই সাবান মেখে

ডুবরে

।। শুঁয়োপোকা, দুয়ো বোকা ।।

শুঁয়োপোকা দুয়ো বোকা সারা দেহে শুঁয়ো,
দেখতে যে বিদ্‌ঘুটে নয় এটা ভুয়ো !
শুঁয়োপোকা দুয়ো বোকা শুধু পাতা খাস,
ধীরে - ধীরে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাস !!

।। উচ্চিংড়ে, নাচা শিং-রে ।।

উচ্চিংড়ে উইচিংড়ে চিংড়ি মাছের মামা,
তিড়িং-বিড়িং লাফাস শুধুই লাফঝাঁপ তোর থামা !
খুশি হলেই গান জুড়ে দিস সুর কী, সা-রে গা-মা ?
উচ্চিঙ্গট উচ্চুঙ্গ . . . . শুঁড় নিচে তোর নামা !!

।। কুমোরে খাসা, বানায় বাসা ।।

কুমোরে পোকা কুমোরে পোকা কুমির পোকাও কয়,
বোলতার মতো দেখতে হলেও রঙটা হলুদ নয় !
রঙ খয়েরি হালকা দেহ খুব 'খাটিয়ে' ভাই,
মাটি দিয়েই বানায় বাসা 'কুমোরে' নাম তাই !!

।। লেদা - মাজরা, করে ঝাঁঝরা ।।

লেদা পোকা ঘোড়া পোকা কাঁটালি পোকা মাজরা,
কাণ্ড - পাতা ফল-ফুল-মূল ফসল করে ঝাঁঝরা !
জাব পোকা আর বাজা পোকা সাতরা পোকার বংশ,
শস্য-শত্রু জানবে এরাই শস্য করে ধ্বংস !!

।। জলফড়িং খাই ধরিং ।।

পুকুর পাড়ে ডোবার ধারে বেড়ায় এরা উড়ে,
শিকার ধরার আশায়-আশায় সদাই মরে ঘুরে !
প্রথম জীবন বছর-খানেক কাটায় জলের তলে,
তাই জেনো ভাই ওদের সবাই 'জল ফড়িং'ই বলে !!

কিংবদন্তির নায়ক সাপ

রক্তিম দাশ

বেশ কয়েক বছর আগের কথা বলছি। তখন সন্ধ্যার সময় প্রায়ই লোডশেডিং হত। এরকমই একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছি, ঘন অন্ধকারের মধ্যে-হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাদের পাশের বাড়ীর ছোট্ট সংহিতা বানান করে পড়ছে বিদ্যাসাগর মশাইএর বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ "সা - - - প - - - লতা", "সা - - - - প - - - - লতা"। অবাক হয়ে ভালো করে শুনলাম আবার একই কথা "সা - - - - প - - - - লতা"। কৌতূহলী মন নিয়ে সংহিতাকে ডাকি, ও বাড়ীর বাইরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম — "কি পড়ছ সা - - - প - - - লতা কেন ? ওটা তো উচ্চারণ হবে সাপ"। সংহিতা ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিলো — "মা বলেছে সন্ধ্যার সময় তাদের নাম করতে নেই। বলতে হয় লতা। নইলে তারা বাড়ীতে ঢুকে কামড়ে দেবে।" সত্যিই কি তাই ? এসো বন্ধুরা আমরা একটু আমাদের এই উপকারি বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করি।

সাপ নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের শেষ নেই। একে নিয়ে গড়ে উঠেছে কত ধারণা, প্রবাদ ! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ইতিহাসে ভয়ের জীবন্ত প্রতীক এই কিংবদন্তীর

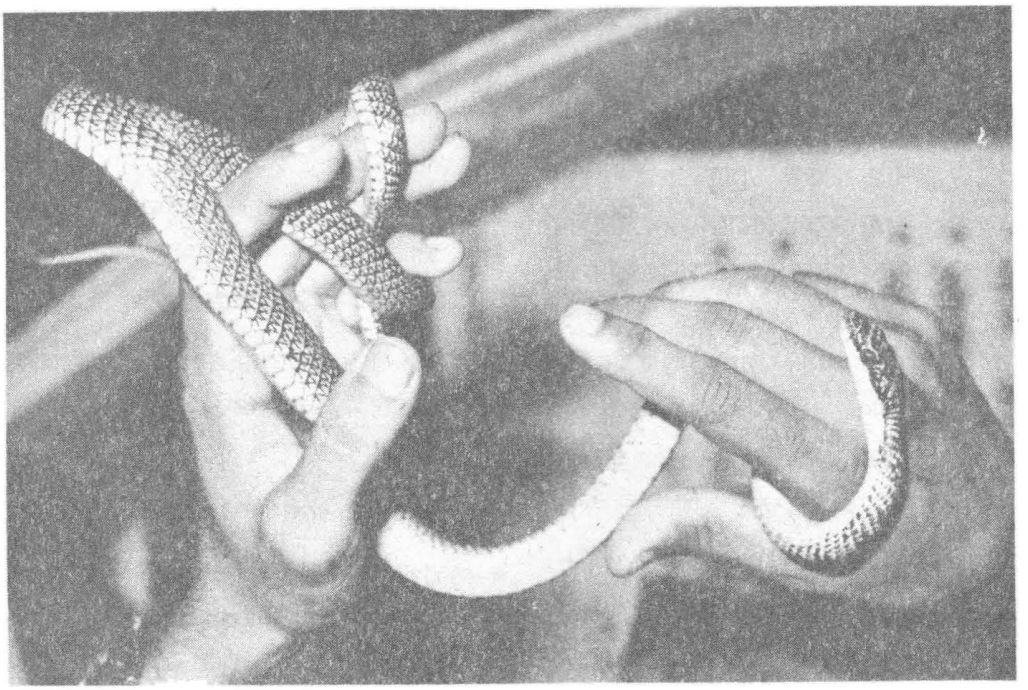

মনসামঙ্গলের বর্নিত সাপ কালনাগিনী (ক্ষীণ বিষ)

নায়ক সাপ। মানুষের জন্মের অনেক আগে থেকে প্রায় দশ, বারো কোটি বছর পূর্বে এরা পৃথিবীতে আসে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩১৭১ ধরনের সাপ আছে, তার মধ্যে ২৮০টি (৮.৮০%) প্রজাতির সাপ বিষাক্ত। নির্বিষ সাপের সংখ্যাই প্রায় ৯১%। সব দেশে কম বেশি সাপ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে প্রায় ২৫০টি প্রজাতির সাপ আছে যার মধ্যে ৭০টি প্রজাতি বিষাক্ত। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ নির্বিষ সাপের কামড়ে বিষ ক্রিয়ায় নয়, সাপ সম্পর্কিত

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য ভয়ে মারা যান। দেখা যায় যত লোককে সাপে কামড়েছে তার মাত্র ১৬% ক্ষেত্রে বিষাক্ত সাপ কামড়েছে। এছাড়া বছরে দশ লক্ষ মানুষকে বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও এর মধ্যে মারা যায় একলক্ষ মানুষ, এদের অর্ধেক ভয়ে, বিষক্রিয়ায় নয়। কারণ আমরা সাপ চিনি সিনেমা দেখে, সাপুড়েদের কাছে তারা যা বলেন তাই সত্যি বলে মেনে নিই আর ঠকে যাই।

★ শারীরিক গঠন ঃ সাপ সরীসৃপ শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের শরীরের রক্ত নাতিউষ্ণ। ফুসফুস একটি (ব্যতিক্রম ময়াল)। সারা শরীর আঁশে ঢাকা। এদের চামড়ার বাইরের স্তর যখন পুরানো বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন সেই চামড়ার নীচে নতুন চামড়া গঠিত হয়, সারা দেহের পুরানো চামড়া তখন ধীরে ধীরে উঠতে থাকে, একেই খোলস বলে। এদের কোন পা থাকে না। এরা ডিম পাড়ে বর্ষাকালে। ডিম ফুটে শিশু সাপের জন্ম হয়। চন্দ্রবোড়া সাপের আবার মাতৃগর্ভে ডিম ফুটে যায়, এবং সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে।

★ সাপের খাদ্য ঃ এরা বিভিন্ন পোকা, মশা (জলঢোঁড়া), ইদুঁর, ব্যাঙ, টিকটিকি যা মানুষের ক্ষতি করে তা খেয়ে আমাদের উপকারি বন্ধুর পরিচয় দেয়। এছাড়া ছোট খাটো জীবজন্তু এরা খায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান ? বিষাক্ত শাঁখামুটে সাপ অন্যান্য বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ খেয়ে নেয়। এরা দুধ বা কলা খায়না, কারণ এদের জিভ চেরা ও ফুসফুস একটি। এছাড়াও ঠোঁটের গঠন অনুন্নত বলে এরা চুষে খায় না। সব খাদ্য গিলে খায়। এরা মাংসাশী তাই কলা খাওয়া কখনই সম্ভব নয়। না খেয়ে সাপ প্রায় তিন মাস থাকতে পারে।

সাপ ঃ প্রকৃত তথ্য ও কুসংস্কার ঃ সাপের মাথায় মণি থাকেনা, বেদেরা মণি বলে ইলিশ মাছের চোখকে বিক্রি করে।

★ সাপ কাউকে সম্মোহন করতে পারে না।

★ আঘাত প্রাপ্ত না হলে সাপ কখনই কামড়ায় না। তাই *হঠাৎ করে সাপের সামনে পড়লে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ* থাকলে সাপ নিজে থেকেই চলে যাবে। কোন কিছু নড়াচড়া না করলে সাপ টের পায় না।

★ সাপ কানে শুনতে পায়না। কারণ সাপের কানের পর্দা নেই । তাই সাপ সাপুড়ের বাঁশি শুনে নাচে না, নাচে সাপুড়ের বাঁশির দুলুনির ফলে ওঠা বাতাসের তরঙ্গকে জিভ দিয়ে জ্যাকবসন্‌স অর্গানের সাহায্যে গ্রহণ করে ভয় পেয়ে।

★ সাপ বুদ্ধিমান প্রাণী নয়। সর্প প্রজাতির মধ্যে শঙ্খ চূড়ই সামান্য বুদ্ধি ধরে। এরা খড় কুটো যোগাড় করে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে।

★ সাপের প্রতিশোধ স্পৃহা নেই।

★ সাপ কোন প্রাণীকে জোরে দৌড়ে তাড়া করতে পারে না। কারণ একটা ফুসফুস বলে হাঁফিয়ে পড়ে, অল্প চলা ফেরায়।

★ লাউডগা সাপ চোখ তুলে নিতে পারে না।

★ কালনাগিনী সাপের লেজ কাটা নয়।

★ দাঁড়াশ (ঢ্যামনা) সাপের লেজে কাঁটা বা বিষ থাকে না।

★ সাপের দাড়ি, গোঁফ হয় না।

★ শুধুমাত্র বর্ষাকালে প্রজননের সময় পুরুষ ও স্ত্রী সাপকে একত্রিত দেখা যায় (ব্যতিক্রম শঙ্খচূড়)।

★ দাঁড়াশ ও কেউটে সাপেরা ভিন্ন প্রজাতির বলে যৌন মিলন সম্ভব নয়।

★ দুই মুখওলা সাপ হয় না। সাপুড়েরা যে সাপকে দুমুখ বলে দেখায় তা বালিয়াড়ি অঞ্চলে দেখা যায়। বালিবোয়া নামে পরিচিত। বালিতে লেজ দিয়ে গর্ত করে বলে লেজের প্রান্ত ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অনেকটা মুখের আকৃতি ধারণ করে।

★ জলঢোঁড়া কামড়ালে শনি/মঙ্গল বার বা গোবরে পা দিলে বিষ হয় না।

★ বেজী সাপের ওষুধ জানে না।

★ ময়াল (অজগর) নিশ্বাসে জীবজন্তু টেনে নিয়ে খেতে পারে না।

★ চারটে পা সহ সরীসৃপ গোসাপ (লির্জাড) সাপ নয়।

★ সাপকে শিকড় দিয়ে বশ করা যায় না বা সাপ পোষ মানে না।

★ বিষাক্ত সাপ কামড়ালে মন্ত্র, শিকড়, তাবিজ, মাদুলি বা বিষ পাথর দিয়ে বিষ নামানো যায় না।

★ ভারতের সাপ ঃ ১। বিষাক্ত

নাম	কত কম বিষে মৃত্যু	কামড়াবার পর মৃত্যুর সময়
কালাচ	১ মিগ্রা	৩-৬৩ ঘণ্টা
ফুরসা	৫ মিগ্রা	২৫-৪১ দিন
শাঁখামুটে	১০ মিগ্রা	—
শঙ্খচূড়	১২ মিগ্রা	—
কেউটে/ গোখরো	১৫ মিগ্রা	১/৪ ঘণ্টা - ৬০ ঘণ্টা
চন্দ্রবোড়া	৪২ মিগ্রা	১/৪ ঘণ্টা - ৯ দিন

২) ক্ষীণ বিষ সাপ ঃ এদের বিষ দাঁত চোয়ালের পিছন দিকে থাকে ও বিষের থলিতে বিষের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় এদের কামড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। উদাহরণ — লাউডগা, কালনাগিনী।

৩) নির্বিষ ঃ জলঢোঁড়া, পুয়ে, হেলে, দাঁড়াশ, তুতুর, বালিবোয়া, ঘরচিতি, মেটলি, কাঁড়, বেঁতে আছড়া ও ময়াল।

★ বিষাক্ত সাপের কামড়ের লক্ষণ ঃ কালাচ, শিয়রদাঁ, ঘামচাটা, ডোমনা চিতি, শাখাঁমুটে ও কেউটে বা গোখরো কামড়ালে কামড়ের স্থানে ব্যথা থাকে না। এবং ক্ষতস্থান ফুলে যায় না। এদের বিষে 'নিউরোটক্সিন' থাকে বলে স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে, চন্দ্রবোড়া কামড়ালে ক্ষতস্থান ফুলে গিয়ে রক্তপাত হতে থাকে। এর বিষে 'ভ্যাসকুলোটক্সিন' এর জন্য রক্তের বিভিন্ন কোষগুলি ভেঙ্গে যায়, এবং শরীরে উন্মুক্ত স্থান দিয়ে রক্তপাত হয়।

★ বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ চিহ্নিতকরণ ঃ

● বিষাক্ত ঃ ১। কেবল মাত্র দুটো দাঁতের দাগ, চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে আরও দুটো উপবিষ দাঁত থাকে (২ সেমিঃ দূরত্বে)।

২। ক্ষতস্থান থেকে চোয়ানো রক্তের সঙ্গে হলদে রঙের জলীয় অংশ বের হয়।

৩। ক্ষতস্থান জ্বালাসহ ফুলতে থাকবে, এবং নীলাভ হবে।

৪। ঘুম ঘুম ভাব ও রোগী আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

● নির্বিষ ঃ ১। অনেকগুলি দাঁতের দাগ থাকবে।

২। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হবে।

৩। জ্বালা বা ফোলা বা ক্ষতস্থান নীলাভ হবে না।

৪। রোগী আচ্ছন্ন হবে না।

● চিকিৎসা ঃ ★ রোগীর ভয় দূর করে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে যাতে সে মানসিকভাবে দুর্বল না হয়ে পড়ে। তাকে ঘুমাতে দেওয়া চলবে না।

★ বিষাক্ত সাপ হলে ক্ষতস্থান ভাল করে পরিষ্কার করে অ্যান্টিসেফ্- টিক মলম দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষতস্থানে হালকা ব্যাণ্ডেজ করা ও ব্যথা করলে "প্যারাসিটামল বড়ি" খাওয়ানো যেতে পারে।

★ হালকা করে বাঁধন দেওয়া যেতে পারে, যদিও বাঁধন কার্যকর নয়।

★ রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে "এ্যান্টি ভেনাম সিরাম" দিতে হবে।

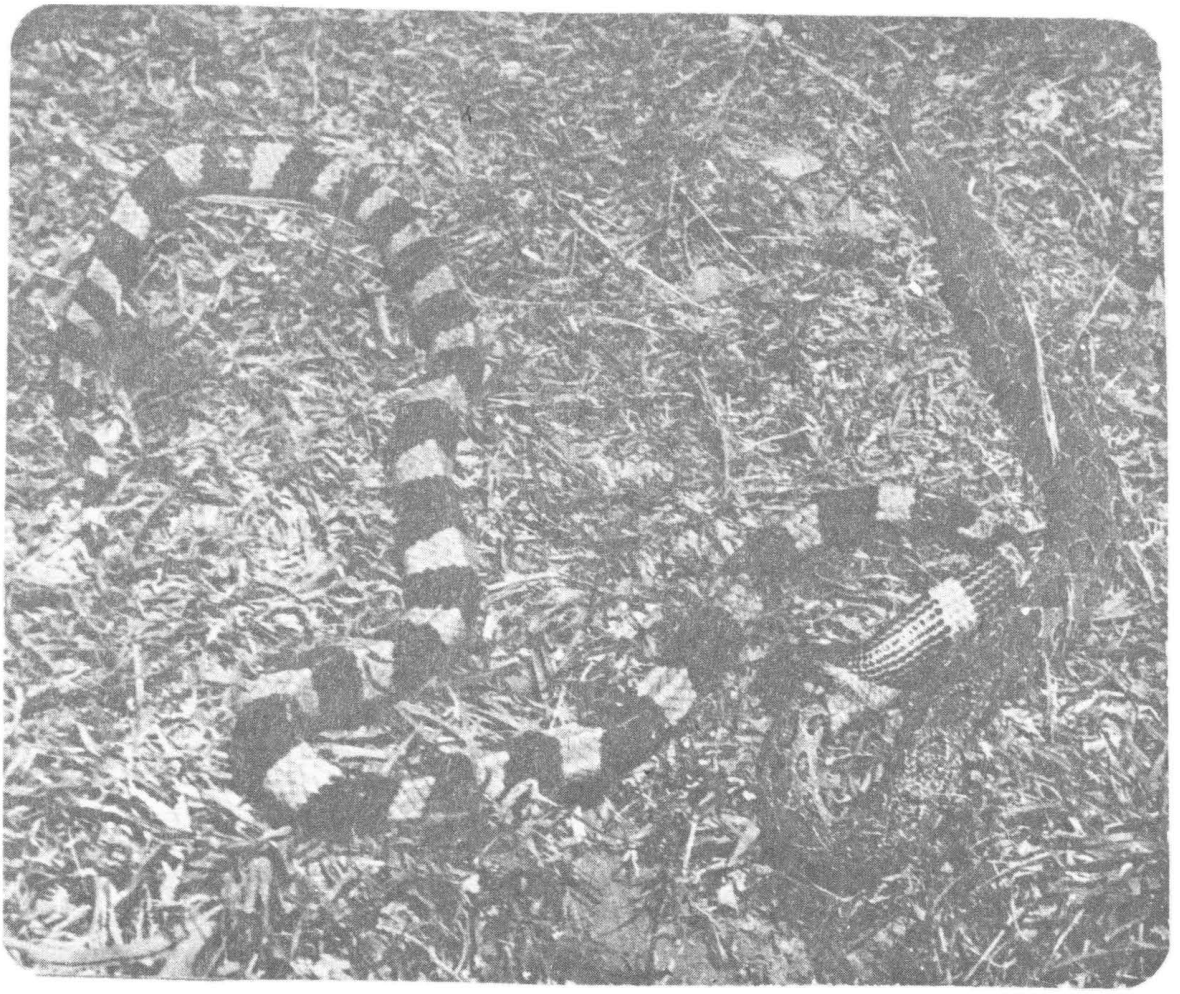

শাঁখামুটে চন্দ্রবোড়া সাপ খাচ্ছে।

আর নির্বিষ হলে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে (সিরাম বাদে)।

সাপের কামড় থেকে রেহাই পেতে হলে ঃ

১। রাত্রে আলো বা টর্চ নিয়ে পথ চলা। সন্ধ্যার পর কামড়াবার ঘটনা সবচেয়ে বেশী ৬৩%।

২। রাত্রে বিছানায় মশারির ব্যবহার।

৩। ঘর ও ঘরের আশ-পাশ পরিষ্কার রাখা। মূলতঃ জঞ্জাল ও ধান চালের গোলায় বিষাক্ত কেউটে, গোখরো ও কালাচ ইঁদুরের সন্ধানে আসে।

৪। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিতে হবে ও ওঝা, গুনিনদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমাদের এই প্রকৃতিতে প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকবার অধিকার আছে। কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারজনিত কারণে সাপের মৃত্যু আজ পরিবেশের বাসতন্ত্রকে ভেঙ্গে দিতে চলেছে। এই পরিবেশে মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনে সাপের ভূমিকাও কম নয়। তাই আমাদের স্বার্থেই সাপের সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। তাই এসো আমরা সবাই মিলে এই অসহায় বন্য প্রাণীটিকে রক্ষা করি হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে।

সকাল থেকে শুরু

জয়ন্ত দাস

ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চায়ে চুমুক না দিলে যাদের সকাল শুরু হয় না তাদের জন্যে সুখবর আছে। শুধু ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতেই নয়, নিয়মিত ও পরিমিত চা সেবন কম বেশী ৫০টি রোগ প্রতিরোধে আপনার হাতিয়ার হতে পারে।

হ্যাঁ ঠিক এরকমই ধারণা করছেন বিভিন্ন দেশের গবেষকরা। আমেরিকান হেলথ ফাউণ্ডেশনের ডক্টর জন ওয়েসবার্গার জানিয়েছেন চায়ের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রভাবে কিছু ক্রনিক রোগ, ক্যানসার এবং হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমবে। ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন মেডিকেল স্কুলস করোনারি আর্টারি থ্রম্বোসিস রিসার্চ অ্যাণ্ড প্রিভেনশন সেণ্টারের ডিরেক্টর জন ফোল্টস-এর মতে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধে চায়ের ফ্লেবোনাইডসগুলির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিছু জাপানী গবেষকদের সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে চায়ের ফ্লুরাইড দাঁতের এনামেলকে মজবুত করে। তাছাড়া বেশ কিছু ওরাল ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলে মাড়িকেও সুরক্ষিত রাখে এই চা। আবার ক্লিভল্যাণ্ড ও ওহিয়োর

একদল গবেষক ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন যে সবুজ চায়ের ক্যাথেগিন নামক রাসায়নিকটি ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে ত্বক ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে। চায়ের এত গুণপনা শুনে যারা ইতিমধ্যেই এককাপ চা শেষ করে আরেক কাপের অর্ডার দিয়ে ফেলেছো তাদের জানাই অতিরিক্ত চা পান কিন্তু মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। কোন খেলোয়াড়ের মূত্রে যে ক্যাফিনের উপস্থিতি তাকে ডোপিংএর দায়ে অভিযুক্ত করে সেই ক্যাফিন কিন্তু চায়েও রয়েছে। এক কাপ চায়ে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। প্রায় ৩০ থেকে ৬০ মিলিগ্রাম।

খিদে দূর করতে যারা খালি পেটে কাপের পর কাপ চা শেষ করেন তাদের জানাই এর ফলে খিদে কিন্তু আরও বেড়ে যায়। কারণ চায়ের ক্যাফিনের প্রভাবে পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পাকস্থলীর মিউকাস মেমব্রেনের ক্ষতি হতে পারে। অতিরিক্ত ক্যাফিনের প্রভাবে আলসার হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিকটির কথা সম্প্রতি জানিয়েছেন আমেরিকার একদল গবেষক। তাদের মতে ক্রোমোজোমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে অতিরিক্ত ক্যাফিন। এমনকি অকালে বুড়িয়ে দিতেও নাকি এর জুড়ি নেই।

তবে পরিমিত ক্যাফিনের প্রভাবে পরোক্ষভাবে অ্যাড্রিনালিন নামক উত্তেজক হরমোন সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতে ক্যাফিনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায়না। আর এসব কারণেই — পাকস্থলির আলসার বা অম্বল যাদের আছে তারা বাদে যে কেউ নিশ্চিন্তে দিনে ২ কাপ চা পান করতে পারেন। তবে চা পানের পদ্ধতি নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে আমাদের মধ্যে। কেউ শুধু লিকার খান, কেউ লেবু চা আর বাকিরা দুধ চা। মজার ব্যাপার হল যে যেভাবে পছন্দ করেন তার সপক্ষেই যুক্তি দেন। আসুন না বিজ্ঞানীরা কি বলেন শুনি।

শুধু চা পাতা ফুটন্ত জলে বেশী সময় ভেজার ফলে লিকার চা-এ ট্যানিনের উপস্থিতি বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ট্যানিন কিন্তু লিভার ও পাকস্থলীর পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া এতে ক্যাফিনের পরিমাণটাও বেশী থাকে। তুলনামূলকভাবে লেবু চা কিছুটা উপকারী, এতে লেবুর গুণটা মেলে, তাছাড়া লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ট্যানিন বিক্রিয়া করে কাপের তলায় থিতিয়ে পড়ে তবে সবদিক থেকে বিচার করলে দুধ চা-ই আদর্শ। ফুটানোর সময় দুধ দিলে দুধের কেজিন চায়ের ট্যানিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এমন যৌগ সৃষ্টি করে যা আমাদের ক্ষতি করেনা। তাছাড়া দুধ ও চিনির পুষ্টিও মেলে। তবে যাদের ডায়াবিটিস বা মিল্ক অ্যালার্জী আছে তাদের দুধ চা না খাওয়াই ভালো।

এতসব আলোচনাই বৃথা হয়ে যাবে যদি কেউ খাঁটি চা পাতাটি না পান। সারা বিশ্বে প্রধানত সবুজ, উলং ও কালো চায়ের প্রচলন থাকলেও আমরা কালো চায়েরই ভক্ত। আর এই কালো চা-এর মধ্যে অতি সহজেই মেশানো যায় চামড়ার গুঁড়ো, লোহার গুঁড়োর মত ভেজাল। তাছাড়া রঙ করা চা পাতা মেলাও অস্বাভাবিক নয়। তাই চা বানানোর আগে অবশ্যই যাচাই করে নেবে বাজার থেকে কেনা চা পাতা খাঁটি কিনা। পুরোনো সাদা খবরের কাগজ (ব্লটিং পেপার হলে ভালো হয়) ভিজিয়ে তার মধ্যে যদি চা পাতা ছড়িয়ে দিই, চা-এ রঙ মেশানো থাকলে ঐ কাগজে ছোপ ছোপ দাগের সৃষ্টি হবে। আর লোহার গুঁড়ো মেশানো থাকলে চুম্বকের সাহায্যে সহজেই তা সনাক্ত করা যাবে।

এই প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে গেছো। তাহলে আরেক কাপ চায়ের অর্ডারই দিয়ে দিও অন্দরমহলে। কারণ পরিশ্রমের পর এক কাপ চায়ের যে অনুভূতি সেটা বোঝার জন্যে গবেষকদের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

অমলতাস

শৈবাল কুমার গুহ

অমলতাসের নাম শুনেছ ? অমলতাস ভারতবর্ষের সুন্দর গাছগুলির মধ্যে অন্যতম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গাছের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে অমলতাস গাছের নতুন নাম দিয়েছিলেন সোনাঝুরি গাছ।

অমলতাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম — ক্যামিদা ফিস্টুলা (ফিস্টুলা = নল)
গোত্র — লেনুমিনোমী
ব্যবহার্য অংশ — ফল, ফুল, পাতা ও শিকড়
প্রধান ভেষজ — মেনোসাইড - A এবং মেনোসাইড B, হাইড্রক্সি মিথাইল এনট্রোকুইনোন, ট্যানিন, মিউসিলেজ, প্রোটিন, ভোলাটাইল অয়েল।

সাধারণত ১৫০০ মিটারেরও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে এই গাছ বেশী দেখা যায়। অমলতাস ইউরোপ মহাদেশের ল্যাবারনাম (Laburnum) প্রজাতির গাছ। সোনালী ফুলের জন্যে অমলতাস সকলের মনোহরণ করেছে। ফুলের সৌন্দর্যের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অমলতাস গাছ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই গাছ হিন্দী ও বাংলাতে 'অমলতাস', মারাঠিতে 'ভাবা', তামিল ও মালয়ালমে 'কোন্নেই' এবং তেলেগুতে 'রেলা' নামে পরিচিত। এছাড়া অমলতাসকে 'মোন্দাল গাছ' নামেও ডাকা হয়। অমলতাসের অন্যান্য নামগুলি হল সোনালী, সোনালু, বাহাভা, কনেই, রেণু, রাখাল বাঁশী, নল বাঁশী, বাঁদরলাঠি আর ইংরেজি নাম ইণ্ডিয়ান ল্যাবারনাম, গোল্ডেন শাওয়ার।

অমলতাস ছোটো থেকে মাঝারি আকৃতির গাছ। লম্বা ছয় থেকে পনেরো মিটার। গুঁড়িখাটো, পাতা ঘন সবুজ — গঠনে মিশ্র প্রকৃতির, প্রতিটির চার থেকে আট জোড়া পত্রক যাদের মাপ লম্বায় পাঁচ থেকে বারো সেন্টিমিটার এবং তার দুই তৃতীয়াংশ চওড়া।

শীতকালে এবং মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে অমলতাসের পাতা ঝরে যায়। পত্রহীন ন্যাড়া গাছে প্রচুর সোনালী উজ্জ্বল হলুদ ফুল ফোটে। এক একটি লম্বা আনত ছড়াতে এইসব ফুলের আবির্ভাব। ছড়ার গোড়ার কাছে যেসব ফুল-কুঁড়ি থাকে সেগুলি আগে ফোটে। এক একটি ফুল প্রায় ৩০-৪৫ সেমি. পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অমলতাস গাছের ফুল ব্যবহৃত হয়।

অমলতাসের ফলও অদ্ভুত রকমের। ইহা সাধারণতঃ ৬০-১০০ সেমি. লম্বা, একেবারে সোজা ও কালোরঙের হয়। একটি অমলতাস গাছে ১০০ টি ফল হতে পারে। প্রতিটি ফলের ভিতরে ৪০-১০০টি পর্যন্ত প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে ডিম্বাকৃতি বীজ থাকে। প্রতিটি কক্ষকে পৃথক করে রেখেছে কোমল মিষ্টি শাঁসের মতো পর্দা, যা কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই মিষ্টি শাঁস আবার বাঁদরদের প্রিয় খাদ্য। গাছে যখন ফুল বা পাতা থাকে না তখন অসংখ্য লাঠির মতো শুঁটি ঝুলতে দেখা যায়। ঝুলন্ত লম্বা শুঁটির জন্যে অমলতাসের চলতি নাম হয়েছে বাঁদরলাঠি।

জমকালো ফুলের জন্যেই অমলতাসের কদর। তাছাড়া এর কাঠও শক্ত দীর্ঘস্থায়ী। পাহাড়ী লোকেরা এর ফুল সব্জি হিসাবে খেয়ে থাকে, আর জ্বরে ওষুধ ও টনিকের জন্যে ব্যবহৃত হয় গাছের শিকড়।

গ্রীষ্মকালে উত্তর-দক্ষিণ কলকাতার বহু পার্ক ও পথে সোনালী ঝুরি নামা ফুল ও অমলতাসের গাছ চোখে পড়ে। প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, শরৎ বসু রোড, গড়িয়াহাট রোড, গোল পার্কের আশপাশে বেশ কিছু অমলতাসের গাছ চোখে পড়ে। তাছাড়া পার্ক সার্কাস, সি. আই. টি রোড, কলেজ স্ট্রিট, সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ এবং লালা লাজপত রায় সরণিতে (নেতাজি ভবনের সামনে) অমলতাসের গাছ আছে। অমলতাস ঘাস জাতীয় গাছ।

ব্যবহার

(i) অমলতাস গাছের ছাল গুঁড়ো করে নারকেল তেলের সাথে মেশানো হয়। এই মিশ্রণটি খোস-পাঁচড়া দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়।

(ii) রেচক বা purgative রূপে অমলতাস গাছের ছালের আশ্চর্য ব্যবহার আছে।

ঘুম নিয়ে ভাবনা

রণতোষ চক্রবর্তী

ভাবতে অবাক লাগে, একজন ষাট বছরের জীবনে বিশ বছর শুধু ঘুমিয়ে কাটান। অথচ ঘটনাটি সত্য। আসলে সারাদিন বা চব্বিশ ঘণ্টার এক তৃতীয়াংশ সময় ঘুমে কেটে যায়। সদ্যোজাত শিশুর ঘুম অনেক বেশি, প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা। বয়সের সঙ্গে ঘুমের সময়ও কিছুটা কমে আসে। ঘুম কেন, এর কোন প্রয়োজন আছে কিনা, এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুধু বিজ্ঞানীদের মনকেই নাড়া দেয় না, সাধারণ মানুষেরও এ নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই।

অজানা অতীতের পুরাণ উপাখ্যানে ঘুম নিয়ে নানা গল্প কাহিনী চলে আসছে। কুম্ভকর্ণের ঘুমের কথা কে না জানে ? সেই যুগে মুচকুন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তিনি নাকি একবার দেবতাদের খুব খুশি করেছিলেন। বিনিময়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি নাকি নিশ্চিন্তে বহুদিন ঘুমোবার বর চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি ঘুমিয়ে চলেছেন। কাহিনী যাই হোক না কেন, সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ জেনে এসেছে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা।

শারীর বিজ্ঞানীদের মতে, বাইরের কিছু উত্তেজনায় মস্তিষ্ক থেকে সংবাদ আদান প্রদান সাময়িক বন্ধ থাকার অবস্থা হচ্ছে ঘুম। দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে ঘুমের প্রয়োজন আছে। মানুষ কতদিন না ঘুমিয়ে বাঁচতে পারে, এমন পরীক্ষা মানবিক কারণে সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন প্রাণীদের ওপর এধরনের পরীক্ষা হয়েছে। যেমন কুকুরের ওপর পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে একটানা ১৪ দিন

পর অবস্থা আশংকাজনক হয় — অবশেষে ঘুমের অভাবে মৃত্যু ঘটে। ঘুমের অভাবে মানুষের বেলায়ও কাজে অনিচ্ছা, মেজাজ তিরিক্ষি, অধৈর্য, স্মৃতিভ্রম — এইসব লক্ষণ দেখা যায়। কাজেই এসব থেকে সহজেই বলা যায়, ঘুম কোন বিলাসিতা নয়। দেহকে সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক রাখতে অবশ্য দরকারি।

ঘুম বিষয়টি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত। ঘুম নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীদের বহু ঘুম-হীন রাত কাটলেও এই নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা গবেষণায় দেখা যায় ঘুমের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপুরের নানা খবর জানতে যেমন ই. সি. জি. রয়েছে, মস্তিষ্ক সম্পর্কে তেমনি ই. ই. জি. যন্ত্রে মস্তিষ্কের নানা খবর জানা সম্ভব। ই. ই. জি-র রেখালিপিতে ঘুমের তিনটি অংশ ধরা পড়ে — একটি হাল্কা ঘুম, মাঝারি ঘুম ও গভীর ঘুম। গভীর ঘুমের মধ্যে আবার একাধিক অবস্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে প্যারাডক্স স্লিপ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সময় চোখের দ্রুত নড়াচড়া হয়, এই কারণে একে র‍্যাপিড আই ম্যুভমেণ্ট অবস্থা (সংক্ষেপে REM) নামে চিহ্নিত করা হয়। সদ্যোজাত শিশু থেকে পূর্ণবয়স্ক সবারই ঘুমে এই অবস্থা দেখা যায়। শুধু মানুষ কেন, অন্যান্য স্তন্যপায়ী ও পাখিদের বেলায়ও এইটি রয়েছে। অবশ্য ঘুমের এই অবস্থা একটানা চলে না। প্রায় ৮০-৯০ মিনিট ব্যবধানে ঘটে থাকে। অর্থাৎ ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমে অন্তত চার থেকে ছয় বার এই অবস্থা (রেম) ঘুরে ঘুরে আসে। ঘুমের এই অবস্থায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্ন কিন্তু সবাই দেখে — বিজ্ঞানীরা এ-কথাই বলেন। স্বপ্নের ঘটনা স্মরণ থাকে না অবশ্য অনেকের। আসলে স্বপ্ন ঠিক যে সময় ঘটছে বা এর ঠিক পরই যদি ঘুম ভাঙ্গে বা হাল্কা ঘুমে পরিণত হয়, তাহলেই স্বপ্ন দেখা বলা হয়ে থাকে।

সে যাই হোক, ঘুমন্ত অবস্থায় দেহে যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় কাজ চলে। তবে যেহেতু দেহকে ঘুমের সময় আলাদা কোন পরিশ্রম করতে হয় না, এজন্য ঘুমের সময় শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, রক্তচাপ, বিপাক কাজ ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ জাগা অবস্থার তুলনায় কিছু পরিমাণে কমে যায়। যদিও ঘামের পরিমাণ ঘুমন্ত অবস্থায় বেড়ে যায়। এছাড়া উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা অনেকটা কমে যায়।

দেহের নানা কাজের জন্য মস্তিষ্ক দায়ী, এবং মস্তিষ্কে নানা নার্ভ কোষ বিভিন্ন কাজের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। মস্তিষ্কের একাধিক এলাকার নার্ভকোষ যেগুলি রেটিক্যুলার অ্যাকটিভিটিং সিস্টেম নামে পরিচিত এরাই দেহকে প্রধানত সজাগ ও জাগ্রত রাখবার জন্য প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয় মস্তিষ্কের একেবারে সর্বোচ্চ কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাবার ব্যাপারেও এদের নির্বাচন ক্ষমতা রয়েছে। জেগে থাকা ও ঘুম - এই দুই বিপরীত ধর্মী শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সঙ্গে রেটিক্যুলার সিস্টেম জড়িত। বাজারে ঘুমের ওষুধ নামে পরিচিত যেগুলি, এরা এই সিস্টেমের মাধ্যমে উত্তেজনাকে অনুভূতি-কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। ফলে ঘুম আসতে সুবিধা। আসলে ঘুমের ওষুধ হচ্ছে ঘুম-ইনডিউসিং এজেন্ট।

ঘুমের সময়কাল অনেকটাই অভ্যাস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বহু কর্মবীরদের দেখা যায় মাত্র কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে সুস্থ থাকেন। তেমনি অভ্যাস ছাড়া পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীর রাত জেগে পড়াশুনা অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে ঘুমের অভাবে শারীরিক অসুবিধা, অন্যদিকে পড়ার বিষয় স্মরণ না থাকা দুটিই হতে পারে।

ঘুম সম্পর্কে নানা মজাদার ঘটনা দেখা যায়। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে হৈ-হট্টগোল। এর মধ্যে ঘুমন্ত মা সন্তানের সামান্য চিৎকারে জেগে উঠছেন। চলন্ত গাড়ির শব্দ থামতেই ঘুমন্ত যাত্রীর ঘুম ভাঙ্গা বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গোলাগুলির শব্দেও সৈনিকের ঘুম, আবার আওয়াজ বন্ধ হলে ঘুমের অবসান — এমনি সব বিচিত্র ঘটনা ঘুমকে বিজ্ঞানীদের কাছে আরও জটিল, রহস্যময় করে তুলেছে।

অনেকের মতে মস্তিষ্ক-নিঃসারিত এক ধরনের বিশেষ, রাসায়নিক যৌগ ঘুমের কারণ, এবং এব্যাপারে ঘুমন্ত প্রাণীর ঘুম আহ্বায়ক - এক জাতের প্রোটিন পদার্থকে আলাদা করে সজাগ প্রাণী দেহে প্রবেশ করিয়ে ঘুম আনার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আশা করা যায় আগামী কিছু দিনের মধ্যে ঘুম সম্পর্কে আরও তথ্য জানা সম্ভব হবে।

বজ্রকীট

প্রদীপ ঘোষ

— "কি বললেন ? পোকা কামড়েছে ? দেখি দেখি হাতটা ! এঃ, এযে সাংঘাতিক ফুলে গেছে দেখছি। কোথায় কামড়েছিল ?"

— "এই আঙুলটায়।" কিংশুকবাবু তাঁর ডান হাতের তর্জনীটা ডাক্তার বোসকে দেখালেন।

— "হুঁ, দু'পাশ থেকে ধরেছিল মনে হচ্ছে। ওটার হুল ছিল, না দাঁড়া ? দেখতে পেয়েছিলেন ?"

— "যতদূর মনে পড়ছে, হুল, দাঁড়া কিছুই ছিলনা পোকাটার।"

— "তাহলে ? আপনি পোকার কামড় খেয়ে বেমক্কা হাতটা ঝাড়তে গিয়ে আঙুলটা ইনজিওর করেননি তো ? হাতটা যেরকম ফুলেছে তাতে মনে হচ্ছে হাড়ে জখম হয়েছে। আজ একটা এক্সরে করিয়ে নিন। আমি লিখে দিচ্ছি কোন কোন ভিউ চাই। এটা উইণ্ডার মেয়ার ক্লিনিক থেকে করাবেন, বুঝেছেন ? ওরা বেশ রিলায়েব্‌ল্ কাজ করে, অন্যদের তোলা রেডিওগ্রাফ তেমন ভাল হয়না দেখেছি। আপাতত আঙুলটায় ড্রেস করে দিচ্ছি, খোলা উণ্ড্ এভাবে রেখে দেওয়া ঠিক নয়।"

ডাক্তার বোস অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন দিয়ে কিংশুকবাবুর আঙুল ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তারপর ফোলা কমানোর জন্যে ব্রুফেন ট্যাবলেটের ব্যবস্থা দিয়ে আর এক কোর্স পেনিসিলিন নেবার পরামর্শ দিয়ে কিংশুকবাবুকে ছেড়ে দিলেন। বললেন —

— "প্রেসক্রিপশনটা রয় ফার্মেসিতে নিয়ে যাবেন, ওরা জেনুইন ওষুধ রাখে। অন্যদের সম্বন্ধে আমার তেমন ভরসা নেই। রয় ফার্মেসি চেনেন তো ? সদানন্দ রোড আর রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ক্রসিংটার কাছে ? আর আগামীকাল বা পরশু এক্সরে প্লেটটা নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, আমার ফী পঁচিশ টাকা আর ড্রেসিং করে দেবার চার্জ কুড়িটা টাকা আমার অ্যাসিসটেণ্টের হাতে দিয়ে যাবেন।

পরদিন এক্সরে প্লেট এবং রেডিওলজিস্টের রিপোর্ট দেখে তো ডাক্তার অবাক। আঙুলের মাথাটা হাড় সমেত এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। গর্তের মাপ দুই মিলিমিটার মত। পরিষ্কার গোল গর্ত, এক্সরে প্লেটে দেখা যাচ্ছে, হাড়ের সাদা ছায়ার মাঝখানে ছোট্ট ঘন কাল ফুটকির মত দাগ।

— "এ আপনার কেমন পোকা মশাই ? কামড়ে হাড় ছেঁদা করে দেয় এমন তো শুনিনি কখনও ! এক মহাভারতে আছে, কর্ণের কোলে মাথা রেখে যখন পরশুরাম ঘুমোচ্ছিলেন, তখন এক বজ্রকীট কর্ণের থাইয়ের মাস্‌ল্ আর ফিমারের হাড় ছেঁদা করে বেরিয়ে এসেছিল," ডাক্তার আগের দিনের ড্রেসিং বদলে শক্ত করে নতুন ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কথা বলছিলেন, "আপনার এই পোকা মনে হচ্ছে সেই বজ্রকীট।"

কিংশুকবাবু একটু শুকনো হাসলেন। ডাক্তার আবার বললেন, "হাড়ে চোট লেগেছে বলেই এত ফুলেছে। তবে জয়েণ্টে লাগেনি, এর জন্যে আপনাকে আর অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে পাঠালাম না। প্লাসটার করাবার দরকার নেই। আঙুলটা খুব বেশী নাড়াচাড়া করবেন না। দিন দশেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম, চার পাঁচ দিন এটা সাবধানে রাখুন, ভেজাবেন না। ভিজিট আর ড্রেসিং চার্জটা আমার অ্যাসিসটেণ্টের হাতেই দিয়ে দিন, কাল যেমন দিয়েছিলেন।"

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে কিংশুকবাবু নিজের বাড়ীতে গেলেন। বুকশেল্‌ফের উপরে একটা শিশি রাখা ছিল, সেই কফির শিশিটা, সেটাকে নামিয়ে আনলেন।

পোকাটা এখনও বেঁচে আছে কি ? হ্যাঁ, আছে। শিশিটা উনি চোখের কাছে তুলে ধরলেন। পোকাটা দ্রুত ওঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। যেন ওঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীর মধ্যে একটা সতর্কভাব। কিংশুকবাবু মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। পোকাটাকে উনি এর আগে এত কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখেন নি। এখন দেখলেন ওর মাথার উপরে চকচকে কালো গোল মত একটা চোখ রয়েছে। একটাই মাত্র চোখ। সেই একচোখে ওটা ওঁর চোখের দিকে চেয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। কিংশুকবাবুর মনে হল পোকাটা ওঁর মনের কথা বোঝবার চেষ্টা করছে। এরপর উনি কি করবেন সেটা ধরতে চাইছে। উনি নিজের চিন্তার ধারা দেখে নিজেই হাসলেন।

যাক্, এটাকে এখন কোন পোকামাকড়ের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পোকামাকড়ের ডাক্তার কথাটা ওঁর নিজস্ব। এনটমোলজিস্ট কথাটা ওঁর জানা নেই, থাকলেও ওটা ব্যবহার করতেন কিনা সন্দেহ আছে। কারণ কীটতত্ত্ববিদ কথাটা জানা থাকা সত্বেও উনি ব্যবহার করতে চান না। পোকামাকড় নিয়েই যারা পড়ে থাকে, তাদের আবার অত কি ? অনেকের আবার ডক্টরেট থাকে, তাই ডাক্তার বলেন। ডক্টরেট ! বিশেষজ্ঞ ! হুঃ! কিংশুকবাবু মনে মনেই মুখ বাঁকিয়ে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। কার লেখায় যেন পড়েছিলেন যে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান কম থেকে ক্রমেই আরও কম জিনিস সম্বন্ধে বেশী থেকে আরও বেশী দূর পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে শেষে একটা দম আটকানো সরু লম্বা অন্ধগলির মত হয়ে দাঁড়ায়। কিংশুকবাবু নিজে বিশেষজ্ঞ নন, কথাটা ওঁর খুব ভাল লেগেছিল।

কিন্তু উনি যে কোন পোকামাকড়ের ডাক্তারকে চেনেন না। কি করা যায় ? আচ্ছা, পাড়াতেই দু'তিনটে বাড়ী পরে একজন আছে, সবাই তাকে নারানদা বলে ডাকে। নানা জাতের ডাক্তারদের সঙ্গে লোকটার চেনা জানা আছে সেটা কিংশুকবাবু জানতেন, কিন্তু লোকটা নিজে যে কি করে সেটা উনি জানেন না। যাই হোক, ওকে ধরে দেখাই যাক না ? একটু আধটু আলাপ আছে ওর সঙ্গে। পাড়ার ফাংশানে একবার কিংশুকবাবু নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেছিলেন। নারানদা তারপর নিজে থেকে আলাপ করেছিলেন ওঁর সঙ্গে, বলেছিলেন, "একদিন আসুন না আমার বাড়ীতে, আমার কবিতার কালেকশান দেখবেন, বিশেষ করে আধুনিক আফ্রিকান কবিতা।" কিংশুকবাবু যাননি। উনি কবিতা লেখেন, কিন্তু অন্যের কবিতা পড়েন না, আফ্রিকান কবিতা তো নয়ই। কিন্তু আজ . . .

নারানদাকে বাড়ীতেই পাওয়া গেল। কিংশুকবাবুকে আসতে দেখেই হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা জানালেন, "এই যে কবি, আসুন, আসুন। এতদিনে সময় হল ? তারপর, বলুন কি খবর ? আরে ? হাতে কি হল ? ব্যাণ্ডেজ কেন ?"

— "অনেক প্রশ্ন করে ফেললেন। তার আগে এটা দেখুন তো ?" কিংশুকবাবু পকেট থেকে শিশিটা বার করলেন।

নারানদা দেখে বললেন, "এতো একটা পোকা মনে হচ্ছে। কি পোকা ?"

— "এই পোকাটা আমার হাতে কামড়ে দিয়েছে, একেবারে হাড় ছেঁদা করে ফেলেছে। আপনাকে দেখাতে আনলাম, আপনার তো অনেক কিছুই জানা আছে শুনি। দেখুন তো চেনেন কিনা ? বিষ টিষ নেই তো ?"

নারানদা পোকার শিশিটা হাত বাড়িয়ে নিলেন। পোকাটাকে ভাল করে দেখে বললেন, "এটা আবার কি ? এরকম পোকা তো কোনকালে দেখিনি! কোত্থেকে পেলেন মশাই এই জীবটিকে ?"

— "সাঁওতাল পরগণায়, শিমুলতলা থেকে।"

নারানদা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এরপর জামাকাপড় বদলে বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে তাঁর পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগেনি, আর গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সায়েন্স কলেজের বাড়ীটার সামনে পৌঁছতে আর দশ মিনিট। কীটতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণ সেনগুপ্তের সঙ্গে কিংশুকবাবুর আলাপ করিয়ে দিয়েই নারানদা পকেট থেকে শিশি বার করে ফেলেছেন।

— "দেখ তো কল্যাণ, এটাকে চিনতে পার কিনা ?"

কল্যাণ সেনগুপ্তের কাণ্ডকারখানা দেখে কিংশুকবাবুর তো নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম ! প্রথমে খালি চোখে, তারপর লেন্স দিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজনায় ভদ্রলোকের চুল প্রায় খাড়া হয়ে উঠল, মুখে মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে "মাই গড !" আর "দিস ইজ আনবিলিভেব্‌ল্‌ !" শুনতে শুনতে কিংশুকবাবু মনে মনে বললেন, "পাগল, পাগল, বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি এবার।"

শিশিটা নামিয়ে রেখে কল্যাণ সেনগুপ্ত কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে কিংশুকবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। কিংশুকবাবুর ভয় ভয় করতে লাগল, পাগলটা এবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে নাকি ? না ঃ, কিংশুকবাবুর কথা আসলে তার মনেও নেই।

প্রায় মিনিট দু'য়েক চুপচাপ কাটল। তারপর ধ্যান ভঙ্গের মত আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে কল্যাণ নারানদার দিকে চেয়ে বললেন,

— "আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না নারানদা। কোন চেনা স্পেসিস নয়, চেনা জেনাস্‌ নয়, ফ্যামিলি নয়, অর্ডার নয় এমন কি চেনা ফাইলামও নয়। মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রাণী এটা।"

— "ইনসেক্‌ট্‌ নয় ?" নারানদা প্রশ্ন করলেন, "কীটপতঙ্গ গ্রুপের নয় বলছ তুমি ?"

— "ইনসেক্ট ? অসম্ভব। বারোটা পা দেখছেন না ? তাছাড়া এটা আর্থ্রোপডই নয়। লক্ষ্য করুন, এটার পায়ে কোন গাঁঠ নেই। আর, একটা চোখ ! একটা মোটে চোখ ? সাইক্লপ আই ! এরকম কোথাও শুনিনি। দাঁড়ান, স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ভাল করে দেখা যাক।"

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ঘর একতলায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কল্যাণ বলছিলেন যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ভিতরটা বায়ুশূন্য থাকে। পোকাটাকে ওর মধ্যে ঢোকাবার আগে ওটার শরীর থেকে জল সম্পূর্ণ বার করে দিতে হবে, না হলে ফুলে ফেঁপে একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার জন্যে নিয়ম হচ্ছে, তরল নাইট্রোজেন, যার তাপমাত্রা শূন্যের একশো সত্তর ডিগ্রী মত নীচে, তার মধ্যে পোকাটাকে ফেলে ওটাকে জমিয়ে দিতে হবে, তারপর ওই জমাট বাঁধা অবস্থাতেই ভ্যাকুয়াম পাম্প লাগিয়ে দিলে জলীয় অংশটা বরফ থেকে সোজাসুজি বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাবে, মাঝখানে তরল অবস্থায় আসবে না, ফলে জমে যাওয়া পোকাটার আকৃতিতে কোন পরিবর্তন হবে না।

— "পোকাটার অবশ্য এরপর বেঁচে থাকবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।" কল্যাণ বলছিলেন কিংশুকবাবুকে, "আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই তো ?"

— "না, না, একেবারেই নেই, আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।" বাবা, পাগলকে কে চটাবে, কিংশুকবাবু মনে মনে বললেন।

কথায় কথায় স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ঘরের দরজায় হাজির হলেন সকলে। স্প্রিং লাগান দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে কিংশুকবাবু চমকে গেলেন, এত ঝকঝকে পরিষ্কার ঘর উনি আগে কখনও দেখেননি। ঘষা কাচের জানলা দিয়ে আসা দিনের আলো ছাড়াও অনেকগুলো ফ্লুয়োরেসেণ্ট টিউবের আলোতে ঘরটা ঝলমল করছে। সাদা এপ্রন পরা কয়েকজন লোক সেখানে কাজ করছে। তাদের একজনকে ডেকে কল্যাণ বললেন, "সুনীল, এই স্পেসিমেনটা স্ক্যানিং করার জন্যে রেডি কর তো।"

— "কি কোটিং দেব স্যার ? গোল্ড না সিলভার ?" সুনীল জিজ্ঞাসা করল।

— "রূপোই দাও," কল্যাণ বললেন। তারপর কিংশুকবাবুকে বললেন, "জলটা শুকিয়ে নেবার পর সাধারণত একটা ধাতুর আস্তরণ দেওয়া হয় স্যাম্‌প্‌লের উপরে, নাহলে স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপে কিছু দেখা যায় না। চলুন, এখন ঘণ্টা খানেক লাগবে সব তৈরী হতে, ততক্ষণ আপনার কাছে সব কথা ভাল করে শুনি।"

ল্যাবোরেটরীর লাগোয়া একটা ঘরে ক্যানটিন। সেখানে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নারানদা আর কল্যাণ কিংশুকবাবুর কাছ থেকে পোকার বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনলেন। শুনতে শুনতে দু'জনেই বিস্মিত হলেন, কিন্তু নানারকম সম্ভাবনার কথা আলোচনা করবার পরও সকলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন।

সুনীল এসে খবর দিয়ে গেল, "স্যাম্‌পল মাইক্রোস্কোপ চেম্বারে প্লেস করা হয়ে গেছে স্যার। এবারে আপনি আসুন।"

ওঁরা আবার ল্যাবোরেটরীতে ফিরলেন। কল্যাণ মাইক্রোস্কোপের সামনে একটা চেয়ারে বসলেন। কিংশুকবাবুর এক মামা আছেন ডাক্তার। তাঁর কাছে মাইক্রোস্কোপ ছিল, সেকালের আমলের, এর্নস্ট্ লাইৎসের তৈরী। সেই মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে কিংশুকবাবু অনেকবার রক্তের স্লাইড দেখেছেন। সেই মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে এর কোন রকম মিলই নেই। এ তো এক বিশাল যন্ত্র, তার গায়ে অগুনতি সুইচ, নব্ আর মিটার বসান। আর, সবজে সবজে রঙের চৌকো মত কাচের তৈরী একটা জিনিস রয়েছে, অনেকটা টেলিভিশনের পর্দার মত। কিংশুকবাবু অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। সুনীল এগিয়ে এসে সামনের প্যানেলের কয়েকটা সুইচ টিপল, কয়েকটা নব ঘোরাল আর টেলিভিশন স্ক্রীনের উপরে একটা উজ্জ্বল সবুজ আলোর বিন্দু দ্রুতবেগে এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া আসা করতে করতে আলোছায়া দিয়ে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। শেষে দেখা গেল সমস্ত পর্দাটা জুড়ে পোকাটার ছবি সবুজ আভায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

কল্যাণ বললেন, "ক্যামেরা লোড করা আছে ?"

— "হ্যাঁ স্যার।"

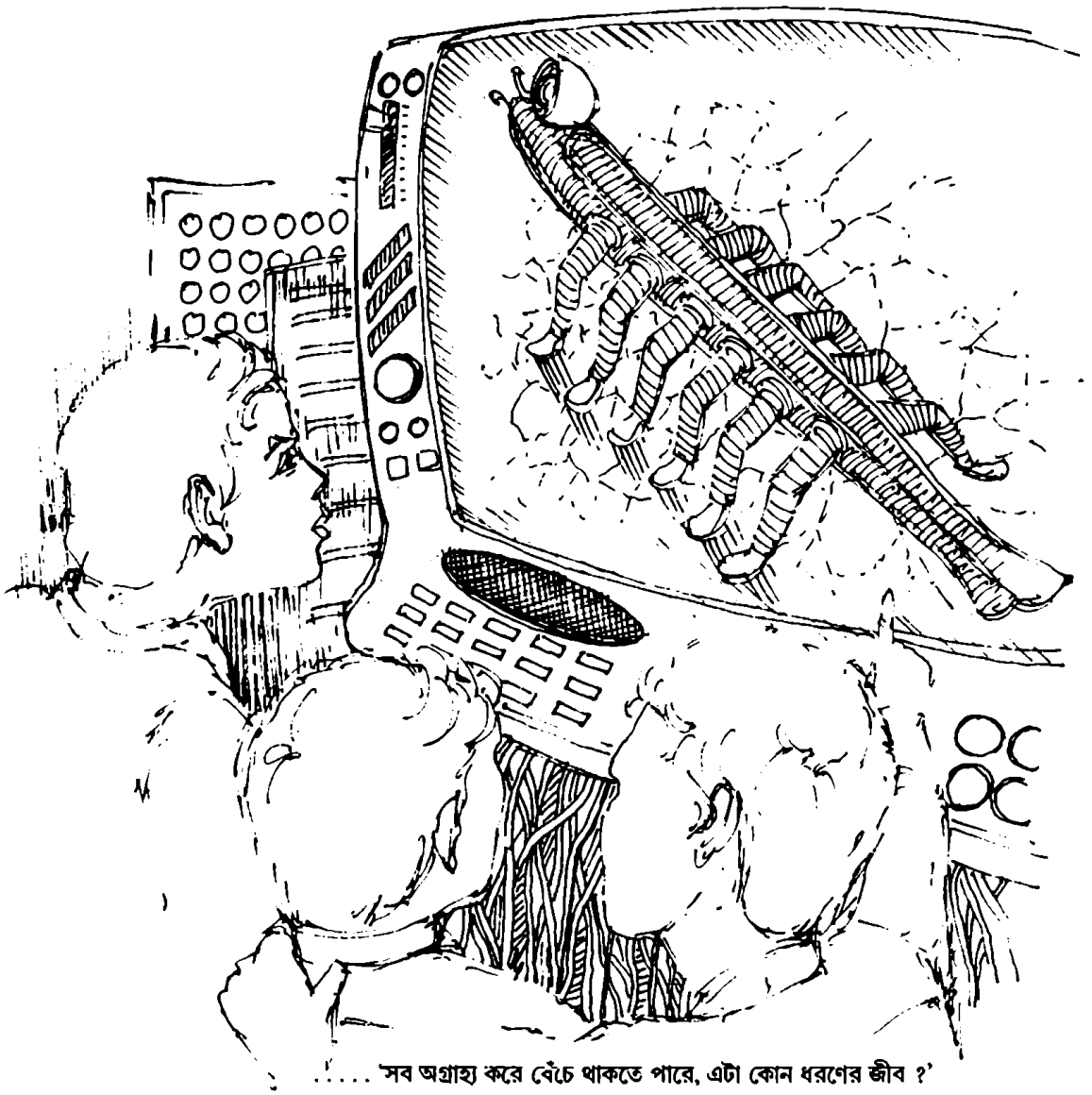

..... 'সব অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে, এটা কোন ধরণের জীব ?'

— "তাহলে একটা ছবি নিয়ে নাও।"

একটা রকেটের গায়ে যদি বারোটা হাত পা লাগিয়ে দেওয়া যায় আর মাথার দিকে যদি একটা সার্চলাইটের মত বড় চোখ বসান যায় তাহলে পোকাটার চেহারার অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া যাবে বোধহয়। কল্যাণ বলে উঠলেন, "দেখুন, দেখুন, পোকাটার হাতে আঙুল রয়েছে, সত্যিকারের আঙুল !"

বাস্তবিকই ওটার সামনের দুজোড়া পায়ে, অবশ্য পায়ে না বলে হাতে বলাই ভাল, চারটে চারটে করে আঙুল রয়েছে। ঠিক মানুষের হাতের মত বুড়ো আঙুল আর তিনটে আঙুল নিয়ে দস্তুরমত হাত। কল্যাণের নির্দেশে সুনীল একটা হাতের ছবি চারশোগুণ বিবর্ধিত করে পর্দার বুকে আনল। প্রতিটি রেখা, প্রতিটি ভাঁজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। এবারে সুনীল একটা চাকা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল আর পোকার ছবিটা একটু একটু করে সরতে লাগল। নারানদা বললেন, "ওর গায়ের দাগগুলো লক্ষ্য করেছ ? ঠিক যেন ইনটিগ্রেটেড ইলেকট্রনিক সারকিটের চেহারা ! সুনীল, তুমি ম্যাগনিফিকেশন কমিয়ে আবার পুরোটা আন তো।"

আবার সম্পূর্ণ পোকাটার ছবি এল পর্দার উপরে। ওটার দিকে এক নজর দেখেই কল্যাণবাবু চীৎকার করে উঠলেন, "সর্বনাশ ! পোকাটা নড়ছে!" পোকাটা একটু একটু করে নড়ছে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। ওটা উঠে দাঁড়িয়ে যে দিক থেকে মাইক্রোস্কোপের ইলেকট্রনের ধারা আসছে, সেই দিকে ফিরে দাঁড়াল। শীতকাতুরে বুড়োরা যেমন করে রোদ পোয়াতে বসে তেমনি ভঙ্গীতে ইলেকট্রনের ধারা নিজের গায়ে লাগাতে লাগাতে পোকাটা হাত দিয়ে গা মুছতে লাগল। প্রথমেই মুছল ওর একমাত্র চোখের উপরের পরকলার মত অংশটা। পাতলা রূপোর আস্তরণটা মুছে যেতেই চোখের জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ও সারা শরীরটা মুছে ফেলল ওর চারটে হাত দিয়ে। পোকাটাকে আর দেখা গেল না।

সুনীল বলল, "এবার ওটাকে বার করে নিই স্যার ?"

— "হ্যাঁ, নাও," কল্যাণ আচ্ছন্নের মত জবাব দিলেন। তারপর একটু থেমে নারানদার দিকে ফিরে বললেন, "এবার ? লিকুইড নাইট্রোজেনের ঠাণ্ডা, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ভ্যাকুয়াম, সব অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে, এটা কোন ধরণের জীব ?"

তিন

সোনপাত্তিয়া শিউমঙ্গলের পথ চেয়ে বাইরের রোয়াকে বসেছিল। ঘরে চাল বাড়ন্ত। অচিন্ত্যবাবু আজকাল টাকা পাঠাতে প্রায়ই দেরী করেন। শিউমঙ্গল কিংশুকবাবুকে ট্রেনে চাপিয়ে নাথমলের দোকান থেকে এক কিলো চাল ধার করে আনবে বলেছে। কাল হাট আছে। সেখানে বাগানের সব্জী বেচে যে পয়সা পাবে, তাই দিয়ে আরও চাল কিনে আনবে। বাচ্চাদুটো সকাল থেকেই ঘ্যান ঘ্যান করছে খাবার জন্যে। কিংশুকবাবু যতদিন ছিলেন, ততদিন ওঁর দৌলতে ওরা একটু ভাল খেতে পেয়েছে। আজ থেকে আবার যথাপূর্বং।

গেট খোলার আওয়াজ হল। সোনপাত্তিয়া মুখ তুলে দেখল শিউমঙ্গল আসছে। গেট বন্ধ করে দুই পা আসতে না আসতে শিউমঙ্গল একটা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল। ওর দিকে দৌড়ে যেতে যেতে সোনপাত্তিয়া চীৎকার করে কেঁদে উঠল। যখন ও শিউমঙ্গলের কাছে পৌছল তখন নিষ্পন্দ শরীরটা থেকে দশবারোটা পোকা নেমে চলে যাচ্ছে। সেই পোকা, যা কিংশুকবাবুকে কামড়েছিল। যার একটাকে শিউমঙ্গল সেইদিনই কাচের শিশির মধ্যে বন্দী করে কিংশুকবাবুর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল।

—"কা ভইল্ ? তনি উঠতো সুনি !" সোনপাত্তিয়া ওর স্বামীর মাথার নীচে হাত দিয়ে ওকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে নির্মম সত্যটা যখন ওর হৃদয়ঙ্গম হল, তখন ও চীৎকার করে কেঁদে উঠে স্বামীর সদ্যোমৃত দেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পরে জানেনা, আঁচলে টান পড়াতে ওর সম্বিৎ ফিরল। ছেলেদুটো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের অবোধ চোখে বিস্ময়, মা এরকম করছে কেন ? বাবাই বা মাটিতে শুয়ে কেন ?

— "এ মা, বহুৎ ভুখ্ লাগল্। বাবুজী চাউল লা দিহিন্ ? সোনপাত্তিয়া উঠে বসে কিছুক্ষণ বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল।

ম্যালেরিয়ার শত্রু সন্ধান

সুজয় গুপ্ত

আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি মশকবাহিত রোগ দেখা যায়। যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানিজ এনকেফালাইটিস। এই রোগগুলো মাঝে মধ্যেই ঘুরেফিরে আসে। বহু লোকজন মারা যায়। অনেক লোক পঙ্গুও হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো মশক বাহিত এই রোগগুলো ভয়ানক মহামারী রূপেও দেখা দেয়। তবে এদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবই সব চাইতে বেশী। আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা এখনো এক কোটির উপর। যদিও ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে এই রোগ সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়, তা সত্ত্বেও কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজও এই রোগের প্রকোপ কম বেশী রয়েই গেছে।

ম্যালেরিয়া মানুষের অন্যতম মশকবাহিত সংক্রামক রোগ। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ প্রথম নথিভুক্ত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ বছর পূর্বে, ইজিপ্টে। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত যে মশকবাহিত রোগে বিশ্বের অধিকাংশ লোক মারা যেত, তাও এই ম্যালেরিয়া। 'ম্যালেরিয়া' নামটির উৎপত্তি খুব সম্ভবত ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ঘটনা এই যে, এই রোগের লক্ষণ, বাহক ও সংক্রমণ পদ্ধতি না জানা সত্ত্বেও তখনো এই রোগের বেশ কিছু চিকিৎসা ছিল। এর অনেক পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ লাভেরান (Dr. Laveran) প্রথম মশকবাহিত এই রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্তে রোগ (ম্যালেরিয়া) সৃষ্টিকারী এক পরজীবী আদ্য প্রাণীর সন্ধান পান। মর্চিয়াফাভা (Morchiafava), ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ঐ পরজীবীটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। এর ঠিক দুবছর পর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং বিজ্ঞানী সেলি (celli) ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী সকল পরজীবী আদ্য প্রাণীদের একটি স্বতন্ত্র গণের (Genus) অন্তর্ভুক্ত করেন। গণটির নাম 'Plasmodium' (প্লাসমোডিয়াম)। সুতরাং এই রোগটির উৎস কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস নয়, একটি সাধারণ নিম্নবর্গীয় এককোষী প্রাণী। যার নাম 'Plasmodium Vivax" (Grassi and Feletti, 1890) ; "Plasmodium falciparum" (Welch, 1897) ; "Plasmodium malariae" (Laveran, 1880) এবং "Plasmodium ovale" (Stephens, 1922)। এই চারটি প্রজাতি ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হলেও, প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স ও প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম-এর দৌরাত্যই মানুষের দেহে সবচেয়ে বেশী।

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে প্লাসমোডিয়ামের যে কোনো প্রজাতিই প্রথমে আমাদের লিভারের অভ্যন্তরে গিয়ে বাসা বাঁধে। সেখানে তারা ধীরে ধীরে রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে। আর রক্তের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদান লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করতে শুরু করে। লোহিত কণিকার ধ্বংস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরেও রোগের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ একদিকে এদের (পরজীবীদের) বংশবৃদ্ধি পায়। অপরদিকে রক্তে লোহিত কণিকারও সংখ্যা হ্রাস পায়। সেজন্যই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে রক্তে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কখনো কখনো ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা এত বেশী হয় যে জ্বর কমে যাওয়ার পরও রক্তে পরজীবীটি থেকে যেতে পারে। প্লাসমোডিয়ামের ভাইভ্যাক্স প্রজাতিটি অবশ্য যে ম্যালেরিয়া ঘটায় তাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কিন্তু ঠিক সময় চিকিৎসা না হলে, প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম যে ম্যালেরিয়া ঘটায় তাতে জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া ফ্যালসিপেরামেরই এক উন্নত জাত কর্তৃক সৃষ্ট ম্যালেরিয়া কোনো কোনো সময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মানুষের মস্তিষ্কে পর্যন্ত সংক্রামিত হয়। এই ধরনের প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম রক্তের পাঁচশতাংশেরও বেশী লোহিত কণিকাকে নষ্ট করে ফেলে।

মশা বা মশকবাহিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কীটনাশকের ব্যবহারও আজ নতুন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই কীটনাশকের ব্যবহার চলে আসছে। অবশ্য সেসময় শুধু মশা মারার জন্যই নয়, কীট পতঙ্গের হাত থেকে ফসল বাঁচানোও এর (কীটনাশক ব্যবহারের) উদ্দেশ্য ছিল। আর তখন থেকে মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের সাথে সাথে মানুষের দেহেও কীটনাশক প্রবেশ করতে শুরু করলো। অর্থাৎ তরিতরকারি, শাক-সব্জী প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষও কীটনাশক হজম করতে শুরু করলো। কীটনাশক ডি.ডি.টি আবার জলে মেশে না, মেশে তেলে। ফলে বিভিন্ন সময় খাদ্যে মিশে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে আমাদের খাদ্যনালী দিয়ে শোষিত হতে পারে। ডি. ডি. টি শরীরের মধ্যে ও স্নেহকোষে জমে। শুধু তাই নয় ডি. ডি. টি গর্ভবতী মায়ের শরীর হতে তার গর্ভস্থ বাচ্চার রক্তেও মিশে যেতে পারে। স্নায়ুপর্দার ভেতরের পটাসিয়ামের গতিকে ডি. ডি. টি বাধা দেয়। ফলে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। যকৃত ও হৃদযন্ত্রেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে এই ডি. ডি. টি.। ডি.ডি.টি এবং অন্য দুই কীটনাশক এনড্রিন ও অ্যালুড্রিন চামড়া দিয়েও শরীরের ভেতর ঢুকতে পারে। শুরু থেকে ডি. ডি. টি-র ব্যবহার এত ব্যাপক হারে হয়েছে যে, মশাও নিজের দেহে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সফল হচ্ছে। ডি. ডি. টি ব্যবহারের ফলে আজ পরিবেশের ভারসাম্যও বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর পূর্বেই এই আভাস পেয়ে, ১৯৭২ সালে আমেরিকা সে দেশে ডি.ডি.টি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই নয়, মানুষের শরীরে এর ক্ষতিকর প্রভাবের কথা মাথায় রেখেই ২০০০ সালের পর আমাদের দেশেও ডি.ডি.টি ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। এই কুপ্রভাবের কথা ভেবেই হয়তো ১৯৯৪-৯৫ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) আমাদের দেশে ডি.ডি.টি ও বি. এইচ. সি. (অপর কীটনাশক) ছড়ানোর জন্য টাকা মঞ্জুর করেনি।

ডি. ডি. টি. ছাড়াও আরো অনেক কীটনাশক রয়েছে যাদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। ডি. ডি. টি-র সমগোত্রীয় মেথক্সিক্লোর এই জাতীয় একটি কীটনাশক। এছাড়াও লিনডেন, টক্সাফেন, ক্লোরডিকন, মিরেক্স স্নায়ু ও লিভারের ক্ষতি করে। ম্যালথিয়ন, ফার্নিট্রোথিয়নও আমাদের স্নায়ুর যথেষ্ট ক্ষতিসাধনে সক্ষম। শুধু তাই নয়, ফুল হতে তৈরী পাইরেথ্রাম মশা মারতে পারলেও মানুষের শরীরে অনেক সময় এলার্জির সৃষ্টি করে থাকে। তবে যারা এইসকল কীটনাশক স্প্রে করেন তাদের শরীরে এর ক্ষতিকর প্রভাব মারাত্মকভাবে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী। মশা দমনে ব্যবহৃত কীটনাশকের এই সমস্ত কুফলের পাশাপাশি রয়েছে কীটনাশকের আজ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা। ফলে সবজায়গায় (অবশ্যই প্রয়োজনীয়) কীটনাশক ছড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। যার জন্য মশারাও অনেক সময় এদের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। গত দু-দশক ধরে মশা মারার জন্য কীটনাশকের পাশাপাশি আরো পদ্ধতিও চালু হয়েছে। যা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষতি করেনা। পরিবেশকেও ঠিক রাখে অথচ মশাকেও মেরে ফেলতে পারে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী গাপ্পি, গ্যাম্বুসিয়া ইত্যাদি কিছু মাছ জলাশয়ে মশা জন্মাবার আগেই তাদের শুককীট খেয়ে ফেলে। মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম হয়।

আই. সি. এম. আর - এর অধীনে ম্যালেরিয়া রিসার্চ কেন্দ্র বিভিন্ন অঞ্চলে স্ফেরিসাইড ও ব্যাকটেরিসাইড নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে মশক দমনে এক নতুন পথের সন্ধান পান। বীজানু দিয়ে মশা মারার গুরুত্বও সেই থেকে বাড়তে শুরু করলো। ব্যাসিলাস থুরিন জিয়েনসিস এই ধরনের একটি মশক দমনকারী বীজানু। ১৯১৫ সালে এই বীজানুটি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি। এর অনেক বছর পর ১৯৭৭ সালে ইজরায়েলে এই বীজানুটির একটি বিশেষ ধরনের উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায় — যা অন্যান্য জীবের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, শুধুমাত্র মশার লার্ভাকে খেয়ে ফেলে। ব্যাসিলাস থুরিন জিয়েনসিস নামক এই বীজানুটি অনেক প্রজাতির মশাই দমন করে। ফলে ম্যালেরিয়া ছাড়াও এর ব্যবহারে ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর, ডেঙ্গু শক্‌সিনড্রোম, জাপানীজ্‌ এনকেফালাইটিস প্রভৃতি রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এই ধরনের বীজানুর দ্রবণকে মশার লার্ভা যুক্ত জলাশয়ে ঢেলে

দিলে এরা মশার লার্ভাকে মেরে ফেলে জলাশয়ে নিজের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। বীজানুটি সাদা গুঁড়োর মতো। জলে সহজেই মিশে যায়। ফলে জলে ছড়িয়ে দিলেও হয়। আবার স্প্রে করেও ব্যবহার করা যায়। এরা বাতাসেও বেঁচে থাকতে পারে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম "ব্যাসিলাস থুরিজেনসিস ভার ইজরালেনসিস।" যেহেতু ১৯৭৬ সালে এর ফ্লাজেলার প্রোটিনের এইচ্ অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে একে চিহ্নিত করা হয়, তাই একে সেরোটাইপ এইচ ১৪, এই অ্যান্টিজেনের মাধ্যমেও চিহ্নিত করা হয়। বীজানুটি আসলে (পূর্ণাঙ্গবস্থায়) টক্সিন বা বিষ যা একমাত্র মশার শরীরে ভেঙ্গে যায় ও লার্ভাকে ধ্বংস করে। অর্থাৎ বীজানুটি শুধুমাত্র মশার লার্ভা দশাতেই কার্যকর। পাশাপাশি, ১৯৬৫ সালে এরূপ আরো একটি বীজানু ফ্লাজেলার প্রোটিন হতে এইচ অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার নাম 'ব্যাসিলাস স্ফেরিকাস' (স্ফেরোসাইড)। এই বীজানুর সহিত ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিসের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এমনকি এদের কাজের মধ্যেও বেশ মিল। মশা ও মাছি উভয়ের উপরই এরা সক্রিয়। প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ১০০ ভাগ মশাই মারা যায়। এদেরকে সাধারণভাবে 'বীজানু কীটনাশক' বলা হয়ে থাকে। বীজানু কীটনাশকের কোনো এণ্ডোটক্সিন না থাকায় অন্য প্রাণীতে এদের বিষক্রিয়া নেই বললেই চলে। পরিবেশের উপরও এদের কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন জলবায়ুতে এদের প্রয়োগ করে কোনো জীবজন্তু বা গাছপালার উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েনি। দেখা গেছে প্রকৃতিতে এরা ৭ থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত (ব্যবহারের পর) কার্যকর থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, রাসায়নিক কীটনাশকের মতো বীজানু কীটনাশক দ্রুত কার্যকর না হলেও, এটি ব্যবহারে অন্তত কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি এটি দামেও অনেক সস্তা হয়। তাই আগামী দিনে রাসায়নিক কীটনাশকের ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মশক দমনে বীজানু কীটনাশকের ব্যবহারের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে মশা দমনের এত উন্নত পদ্ধতি থাকা সত্বেও, মশকবাহিত রোগ ম্যালেরিয়া দমনে বিজ্ঞানীরা আজও সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এখনো বহু মানুষের জীবন হানি হয়। 'ম্যানুয়েল প্যাটারও' (Manuel Patarroyo) নামক এক কলম্বিয়ান দাবী করেছেন। যদিও এখনো পর্যন্ত বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের কাছে এই দাবী সর্বসম্মতভাবে গ্রাহ্য হয়নি। এই ভ্যাকসিনের নাম দেওয়া হয়েছে "Spf 66"। এছাড়া ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ হেলথ-এ কার্যরত বিজ্ঞানী 'ডেভিড কাসলও' (David Kaslow) - এর আশা ম্যালেরিয়া রোধে তার ভ্যাকসিন হবে 'altruistic', অর্থাৎ অন্যান্য রোগের মতো এই ভ্যাকসিন প্রাথমিক রোগীকে রোগমুক্ত করতে না পারলেও, এই ভ্যাকসিন গ্রহণকারীর দেহ থেকে মশা নতুন করে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে পারবেনা। এই ভ্যাকসিন মূলত "pfs 25" নামক একধরণের প্রোটিন, যা শরীরে প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি তৈরী করবে। এই ভ্যাকসিন আসলে পরোক্ষভাবে মশাকেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু এক দেহ হতে অপর দেহে ছড়াতে বাধা দেবে। ফলে বিজ্ঞানীদের আশা মশা যেভাবে রোগের বিস্তার ঘটাতো তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রতিষেধক হিসাবে যে ওষুধটি সাড়া জাগিয়েছিল তা কোনো ল্যাবরেটরিতে তৈরী হয়নি। তা ছিল সম্পূর্ণ উদ্ভিদজাত। অর্থাৎ ভেষজ। সেটি ছিল সিঙ্কোনা গাছের ছালের রস। এমনকি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই ভেষজই ছিল ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। পরবর্তীকালে অবশ্য এর অনুকরণে ম্যালেরিয়ার অনেক ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজ আবার কিছু বিজ্ঞানী অতীতের হার্বালিষ্টদের মতো বনৌষধির গুণাগুণ নিয়ে পুণরায় মূল্যায়ন শুরু করেছেন। আর এর ফলেই সম্প্রতি চীনা বিজ্ঞানীরা সেদেশে একটি গাছের সন্ধান পেয়েছেন। যার বৈজ্ঞানিক নাম "আর্টেমিসিয়া-অ্যানুয়া", এবং চীনা ভাষায় একে বলা হয় "কিংহাও"। চীনা হার্বালিষ্টরা ৩৪০ শতক থেকে এই গাছটির সাথে পরিচিত। একসময় এটিকে চীনের যত্রতত্র পাওয়া যেত। সেসময় নাকি এই গাছটিকে জলে ভিজিয়ে সেই জল ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে পান করা হতো। নথি হতে

আরো জানা যায় যে, ১৫৯৬ সালে একজন চীনা হার্বালিষ্ট-এর কাঁপুনি দিয়ে জ্বরের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার উল্লেখ করেন। আমাদের দেশের দার্জ্জিলিং-এও কিংহাও-এর অন্য এক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগও ৭ - ৮ বছর আগেই এই গাছের উপর পরীক্ষা শুরু করে। কলকাতার পরিবেশে তাঁরা গাছটির বংশবৃদ্ধি ঘটান এবং দেখেন তার সংখ্যা আশানুরূপ নয়। আসলে এরা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার উদ্ভিদ। আমাদের দেশে তাই দার্জ্জিলিং-এ (বা কাশ্মীরে) এগাছের চাষ করা যেতে পারে।

পৃথিবীর বহু দেশেই এই গাছের উপর আজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এবং পরীক্ষায় দেখা গেছে, কিংহাও প্রয়োগের বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ম্যালেরিয়ার জ্বর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরে আসে। শুধু তাই নয়, কিংহাও প্রধানত প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম আক্রান্ত ম্যালেরিয়ায় (সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া) অধিক কার্যকর। আগামী দিনে বিজ্ঞানীরা যদি সত্যিই একে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এক হার্বাল মেডিসিন রূপে আমাদের উপহার দিতে পারে তবে তা হবে এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার।

আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে

তোমাদের অনেকেই গ্রাহক হয়েছো

এখনও যারা হওনি

দেরি করো না আর

এক বছরের গ্রাহক হয়ে যাও

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হতে পারবে

বছরের গ্রাহক চাঁদা মাত্র পঞ্চাশ টাকা

প্রতি জেলায় আমাদের অপিসে খোঁজ নাও।

জোড়া ছড়া

অরুণাভ মিশ্র

।। উর্জা গ্রামে ।।

ইলেক্‌টিরির তার আসেনি উর্জা গ্রামের আশে পাশে
সন্ধ্যে হলেই আঁধার জমে, টিম্‌টিমিয়ে জোনাক্ হাসে।
লম্ফ, পিদিম্, ডিম-আলোতে সন্ধ্যে মানেই গভীর রাত
চাঁদনী রাতে জোৎস্না গাঙে অলস ভেসেই রাত প্রভাত।।

সেই সে গ্রামে এখন রাতে ঘুচে গেছে অন্ধকার,
সন্ধ্যেবেলার অলস সময় এখন বুঝি বন্ধ তার।
পথের ধারে বিজ্‌লী আলো, বিজ্‌লী আলো ছোট্ট ঘরে
ইলেক্‌টিরি তার এলো না — এসব হল কেমন করে ?

এসব হল সহজ ভাবেই জানে তোতন, ছোট্ট পুপাই,
সৌর কোষে সারা সকাল আলোক ধরার নেইকো কামাই।
আলোক ধরে বানিয়ে তড়িৎ জমা করে তড়িৎ কোষে,
সেই তড়িতেই আলোর জোয়ার, সন্ধ্যেবেলা আঁধার ভাসে।

সেই তড়িতেই চলছে টিভি, চলছে দেখি সংখ্যা ঘড়ি
গাঁয়ের মানুষ গর্বে হাঁটেন আলোক-ভেজা রাস্তা ধরি।
বায়ো গ্যাসে রান্না করেন, রান্না করেন নূতন চুলায়
কম জ্বালানী খরচ তাতে, ধোঁয়া ঘরের বাইরেও যায়।।

সোলার হ্যাজাক সাম্‌নে রেখে পুপাই পড়ে, তোতন পড়ে
সোলার টিভি, সোলার ঘড়ি কমিউনিটি হলের ঘরে।
সমানতরো ব্যস্ততা আজ যখন গ্রামে আঁধার নামে
রাত্রি এসে থম্‌কে গেছে নানান নামের উর্জাগ্রামে।

।। গাছ - গাছালি ।।

বলো কে কে যৌগিক, মৌলিক পত্র
একবীজপত্রী কে - দ্বিবীজপত্র ?
ব্রততী ও আরোহীর তফাৎটা কি কি
কে তাদের বাম আর দক্ষিণাবর্তী ?
কার ফুল রাতে ফোটে, কেবা বল সকালে
ছেলেবেলা চেনা গাছ হারিয়েছে অকালে !

বেল যুঁই শেফালীর ম ম করা গন্ধ
আরও আছে মিঠে বাস কামিনী ও কুন্দ
কোন মাসে ফোটে কারা জানা আছে ঠিক ঠিক ?
নিম ফুলে মধু খোঁজে পরদেশী মাছি, ধিক !

কোনগুলো আগাছা কোন গাছ ওষধি
কার কাঠে আসবাব, কেবা স্রেফ জ্বালানী ?
একবার ফুল দেয় ফল দেয় কত গাছ
কত গাছ আছে যারা অকৃপণ বারো মাস।
কারা লতা, গুল্ম কে, ঝোপ গড়ে কোনটি
কে বলো খাড়াই ওঠে সিধেসাদা মনটি ?

কত শত রকমের গাছে ভরা পরিবেশ
একটিও না হারায়, এসো জানি নির্নিমেষ।

রং চঙে বিপদ

অসীম বসাক

বাড়ীর প্রধান ফটকের বুকে সাঁটা — "কুকুর হইতে সাবধান", দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। সন্ত্রস্ত বা ভীত হই কিন্তু আতঙ্কিত হই না। আশা পাই যে, সাড়া দিয়ে প্রবেশ করলে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

যদি দেখি লেখা আছে — "সাপ। সাবধান।", তখন কি হবে ? ভয় পাব বইকি। অবশ্যই ভয় পাব। সাপ বলে কথা ! বাপরে বাপ ! তবে বাবুরাম সাপুড়ের সাপেরা হলে ভয় নেই। কারণ ওরা ফোঁস ফাঁস করে না। আর দুশ্চাশের ত প্রশ্নই ওঠে না। তবুও থমকে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলে গৃহকর্তা হেসে বলবেন — ভয় পেও না ছেলে

ভয় পেও না

কেউটে নয়, গোখরোও নয়

সামান্য ! এ হেলে !

সে যাই হোক, হেলেই হোক আর বেলেই হোক, সাপ বলে কথা। বাপরে বাপ ! তবুও ভয় পাব না। কারণ আমি অন্তত একজনের নাম জোর গলায় বলতে পারি যার ঘরবাড়ি, আহার-নিদ্রা, স্বপ্ন-বাস্তব সবই সাপকে ঘিরে। তিনি হলেন শ্রী দীপক মিত্র। সর্প বিশারদ।

এবার অবাক হওয়ার পালা। নোটিশ ঝুলছে — "সাবধান ! সামনেই রং ! সাবধান !"

এ আবার কেমন হুঁশিয়ারি ?! রংকেও ভয় পাব ! থুড়ি ভয় পেতে হবে। তাহলে প্রজাপতির রঙিন নাচ, নীল আকাশের বুকে রামধনুর সেতু, গোধূলির সোনালি সীমান্তে সিদুঁরে হরিয়ালী, শরতের সাদা মেঘ, কালবৈশাখীর বজ্রকালো ঝড়, নিকষকালো আকাশের বুকে নক্ষত্রের পরশমনি গুনব কি করে ? কখনও ত শুনিনি এমন ! রংকে ভয় পেতে হবে ! হবে হবে। এবার থেকে হবে। শান্ত কচি নরম রঙের যাদু যেমন মনকে তাজা করে, দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়, হৃদয়কে প্রজাপতি করতে পারে ; ঠিক তেমনিই কড়া, তেজি, দুরন্ত গতির জেদি রঙের ঝলকানি মনকে করে তুলতে পারে বিভ্রান্ত, মস্তিষ্ককে করতে পারে আঘাত। বিশেষত শিশুকে করতে পারে আঘাত। কিভাবে ? কিভাবে !?

বলছি। একটু বাদেই বলব। আগে বলি এমন অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারটা মাথায় এল কেন ?

তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। চিন্তায় ফেলেছে দারুণ গতিশীল কর্মকুশল এক জাতিকে। দেশটার নাম — নিশীথ সূর্যের দেশ — জাপান। আর জাতি ! বুঝতেই পারা যাচ্ছে — জাপানী।

বুধবার। সতেরোই ডিসেম্বর, ১৯৯৭। মাত্র এক সপ্তাহ পেরোলেই বড়দিন। মজার দিন কেক খাওয়ার দিন। বেলুন ওড়ানোর দিন। আরেকটু এগোলেই নববর্ষ — শোগান (জাপানী ভাষায় নববর্ষ)। নতুন বছর, নতুন আনন্দ, নতুন নতুন মজা, নব আশা।

রাত এগোচ্ছে। বাড়িতে বড়রা ফিরে এসেছে কাজ কর্ম সেরে। শিশুরা টি ভি দেখছে। ওরা কমিকস্ ভালবাসে। জাপানী দূরদর্শনের মুখ্য শিশু আকর্ষণ অতি জনপ্রিয় কার্টুন শো — পোকেমোন (POKEMON) মানে পকেট দানব।

গল্পটা এরকম — এক শিশু আর এক পুঁচকে দানব। যার নাম পকেট দৈত্য। চেহারা অনেকটা বেড়াল ছানার মত। ওরা দুজনেই খুব ব্যস্ত। একটা কমপিউটার প্রোগ্রাম নিয়ে ওরা মত্ত। যেন দুজনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে — বুদ্ধি, সময় ও ক্ষিপ্রতার। ঘড়ির কাঁটাও থেমে নেই। টিক্-টিক্ ঘুরেই চলেছে। এক - দুই - তিন - - - প্রায় ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে। টি ভি স্ক্রিনে হঠাৎ অতি উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি — ঘন নীল, ঘন লাল ও সাদা আলোর অতি

দ্রুত দাপাদাপি, নাচা নাচি আর উন্মত্ততা যেন সূর্যের অন্তস্থল থেকে আলোর বিস্ফোরণ ! শয়ে শয়ে ফোন বেজে উঠল হাসাপাতালের এর্মাজেন্সী ইউনিটে। অভিভাবকদের হা হুতাশ মেশানো আর্তস্বর — "আমাদের শিশুরা বমি করছে, ভয়ে কাঁপছে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। কি করব ?"

মুহূর্তে হুটার বাজিয়ে ছুটে এল দ্রুতবেগি বেগবান অ্যাম্বুলেন্স। ভরে গেল হাসপাতালের চত্বর। একজন নয়, দুজন নয় প্রায় সাতশো শিশু ঐ আলোর ঝলকানি সহ্য করতে পারে নি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে দারুণভাবে। ঘন ঘন বমি করছে, থর থর করে কাঁপছে বা মরার মত নিস্তেজ হয়ে গেছে।

জাপান। গতির দেশ জাপান। আধুনিক ইলেকট্রনীয় প্রযুক্তির মোড়কে মোড়া দেশ জাপান। কমপিউটার চিন্তায় আবিষ্ট জাপান। একি উপহার দিল নববর্ষের দোরগোড়ায় একুশ শতকের জাপান ! ঐরকম কার্টুন ওদেশে কয়েক গণ্ডা চলে। পকেট দানব জনপ্রিয়তম কার্টুন ছবি। কিণ্ডার গার্টেন ও নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাইমারী শিশুদের জন্য তৈরি ছবি। অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রায় নয়মাস ধরে একটানা চলেছে। তাহলে হঠাৎ কি হল ! এমনটা হল কেন ? যা তা কথা নয়। প্রায় ৭০০ জন শিশু একসাথে অসুস্থ ! ভেবে দেখতে হচ্ছে।

রং মানেই আলো। আলো আসলে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। খটমটে লাগছে কথাটা না ? জলে ঢিল ফেললে যেমন ঢেউ খেলে তাকে বলে তরঙ্গ। আলো ঐরকম তরঙ্গ বা ঢেউ খেলানো পথে ছুটে বেড়ায়। আর ঐ পথে যেতে যেতে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ আর চুম্বক দুরকমের ঘটনাই ঘটতে পারে। সাদা আলো আসলে সাত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের আলোর মিশ্রণ। বেগনি, গাঢ় নীল, আসমানী বা আকাশী নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল — বা বেনীআসহকলা (VIBGYOR) — এই হল আলো — একসাথে মিলে মিশে সাদা বর্ণহীন নির্মল পবিত্র আলো। আলো দেখা যায় না। কিন্তু আলোকিত বস্তু বা আলোর বন্যায় স্নান করা বস্তু দেখা যায়। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলো গুরু মস্তিষ্কের মোটর কেন্দ্রে বিশেষ অনুভূতি বা প্রতিবেদন সৃষ্টি করে। আমরা আলোর মজা অনুভব করি। যেমন, লাল আলো আমাদের সন্ত্রস্ত করে. সবুজ বা নীল আলো আমাদের দৃষ্টিকে আরাম দেয়, জ্যোৎস্না রাতের চাঁদের জমিতে সূর্যের প্রতিফলিত রূপোলী আলোর বন্যা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু আমাদের স্নায়ুর গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী এবং আলোর কম্পাঙ্ক ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী স্নায়ুকোষে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদন অনুরণিত হয়।

এইজি ওকা। জাপানী ডাক্তার। তিনি শিশুদের ওপর ভিডিও গেমসের প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার মতে হঠাৎ করে গাঢ় লাল আলোর ঝলকানি শিশুর শরীরে মৃগীরোগের মত ঘটনা ঘটাতে পারে। ঐ রাতে টিভির প্রোগ্রামে আলোর ঝলকানি ছিল অতি তীব্র ও একটানা। তাই এমনটা ঘটেছে। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে ভয় নেই। ঠিক হয়ে যাবে। এ আঘাত দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে না শিশুদের।

যাক ! হয়ত রক্ষে পাওয়া গেল এ যাত্রায়। জাপানী ডাক ও তার বিভাগীয় প্রধান মিঃ ইওশিহিকো ফুজিওয়ারা তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। ঐ কার্টুনটির সমস্তরকমের শো বন্ধের আদেশ দিয়েছেন। তার মতেও হয়ত অতিদ্রুত ও অতি গাঢ় লাল, নীল এবং সাদা আলোর দীর্ঘ ঝলকানিই এ কাণ্ডটা ঘটাল।

শিশু। সরলমতি শিশু। তার দুনিয়া রঙিন স্বপ্নে পরিপূর্ণ। রামধনুর পথে প্রজাপতির নরম ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায় তার সবুজ সোনালী মন। সেই মনে রঙের বিস্ফোরণ ! কে জানে কোন আগামী বিশ্ব গ্রাস করতে আসছে আমাদের !!

পৃথিবীর সকল শিশুদের জন্যেই রয়েছে আমাদের ভালোবাসা। এই ঘটনা থেকে আমরা নিশ্চয়ই শিক্ষা নেবো। চাইবো এমন ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনও ঘটবেনা।

আমাদের তারা সূর্য

অলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় মহাবিশ্বে কি কি আছে তার একটা সাধারণ ধারনা দিয়েছি। তারা আছে, গ্রহ আছে, ছায়াপথ আছে. পাল্‌সার, কোয়াসার, ব্ল্যাক হোল এসব আছে। বুঝতেই পারছ, আরও অনেক কিছু আছে। লিখতে গেলে লম্বা হয়ে যাবে। তাই যেটা অনেক আসবে আমরা তখন সেটা আলোচনা করব। তবে বাংলা ভাষায় 'বিশ্ব' কথাটার মানে পৃথিবীও হয়, মহাবিশ্বও হয়। বলা বাহুল্য আমরা দ্বিতীয় মানেটাই ব্যবহার করছি।

মহাবিশ্বের ইউনিট হচ্ছে তারা। তারার জগতেই গ্রহ, গ্রহাণু, উপগ্রহ এসব থাকে। এই তারাগুলোর প্রধান উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। হাইড্রোজেন ৭৫%, হিলিয়াম ২৪.৯%। তার মানে অন্য পরমাণুগুলো হাজার ভাগের এক ভাগ কি তার থেকেও কম থাকে। এই যে হিলিয়ামটা এটাও এসেছে হাইড্রোজেন থেকে। তারা তৈরির আগে আগে হাইড্রোজেন ১০০ ভাগ ছিল। অন্য মৌলিক পদার্থগুলো তারা তৈরির সময়ে তৈরি হয়েছে। পড়তে পড়তে তোমাদের মনে হতে পারে আমরা বাস্তব পৃথিবীতে কিন্তু হাইড্রোজেন খুব কম দেখি। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সিলিকন এসবই ত' পৃথিবীর বুকে আছে। তার উত্তরে আমি বলব, পৃথিবীটা এত নগণ্য যে তার মধ্যে বসে থেকে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বোঝা যাবে না। মহাবিশ্ব অন্যরকম। সব তারা একরকম ভাবে তৈরি হয়। আমাদের সূর্য একটা তারা। তাই তারা সম্বন্ধে কিছু জেনে নি।

তারা তৈরির আগের পর্যায়ে মহাকাশে অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। (তারও আগে কি ছিল সেই প্রসঙ্গটায় ইচ্ছে করে যাচ্ছি না)। এই পরমাণুগুলো মাধ্যাকর্ষণে কাছে আসতে থাকে। এটা বলের মত গড়ে ওঠে। যত বড় জিনিস হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তত বেশি হয়। তাই এটা আরও হাইড্রোজেন অণু মাধ্যাকর্ষণে টানে। এই করতে করতে ছোটোখাটো যে বল মত জিনিসটা সেটা আরও ভারী হতে থাকে। এবং মাধ্যাকর্ষণে তা সঙ্কুচিত মানে আকারে ছোট হতে থাকে। এর ফলে আবার এই বলটার কেন্দ্রের উষ্ণতা বাড়তে থাকে। যত বেশি হাইড্রোজেন এসছে, যত ভারী হচ্ছে, তত উষ্ণতা বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে হাজার দুহাজার না, যখন ১ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়, তখন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো এক প্রকার পদ্ধতিতে হিলিয়ামে পরিণত হতে থাকে। হাইড্রোজেনের পরমাণুর একটা প্রোটন। হিলিয়ামের পরমাণুর দুটো প্রোটন, দুটো নিউট্রন। প্রোটন আর নিউট্রনের ভর সমান। প্রচণ্ড উচ্চচাপ আর উচ্চতাপে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো জুড়ে যায়, এবং তার থেকে হিলিয়াম পরমাণু আর বিপুল পরিমাণে শক্তি হয়। এই পদ্ধতিটার নাম উত্তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়া। ইংরেজীতে বলে thermo-nuclear fusion (থার্মো নিউক্লিয়ার ফিউসান)। পৃথিবীর বুকে হাইড্রোজেন বোমা এই পদ্ধতিতেই তৈরি হয়। তারার মধ্যে (যার মধ্যে সূর্য একটা) মিনিটে মিনিটে কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোম ফাটছে। সূর্য অনেক অনেক দূরে, ভয় নেই। লাভ আছে। সূর্যের থেকে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি তৈরি হয়, আমরা বাঁচার পক্ষে সেটা অপরিহার্য।

হিলিয়াম ভারী গ্যাস বলে এটা সূর্যের কেন্দ্রে চলে যায়। হাইড্রোজেনটা বাইরের দিকে চলে যায়। সেখানেও উষ্ণতা বেশি থাকে বলে ফিউসান হয়েই চলে। কিন্তু যখন ফিউসান অনেকটা এগিয়ে যাবে, তখন আমাদের তারা (সূর্য) আর হাইড্রোজেন ফিউসান করতে পারবে না। তখন কেন্দ্রের হিলিয়ামগুলো ফিউসান করে আরও ভারী পরমাণু সৃষ্টি করবে। বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এইসব।

সূর্য যে ধরনের তারা তাতে লৌহ পর্যন্ত পরমাণু সৃষ্টি হবে। কিন্তু আরও বড় তারাগুলো যখন ফেটে যায়, বাইরের খেলাটা যাকে সুপারনোভা বলে (যেটা আমরা

পরে বিশদ আলোচনা করব) তার থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত সব পরমাণু তৈরি হয়।

আমরা পৃথিবীতে কিন্তু ইউরেনিয়াম পর্যন্ত সব পরমাণু পেয়ে থাকি ? এগুলো সুপারনোভা ফেটে এসেছে। সূর্য যে হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে এসব পরমাণুগুলো ছিল। তাই আমাদের তারা সূর্য এখন হিলিয়ামের থেকে ভারি কোন পরমাণু সৃষ্টি করতে পারে নি। এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে কোন এক সুপারনোভার থেকে আসা অণু, সূর্য তৈরির সময় থেকেই উপস্থিতি ছিল। সূর্যের আগে অনেক অনেক তারা তৈরি হয়েছে।

আমাদের তারা সূর্য অত্যন্ত ছোট ধরণের তারা। একে বলে G ধরণের তারা। তারাদের মধে দৈত্য হল O, B, A, K তারারা। তার ছোট G, K, M এটা হলে বামন মানে ছোট। আমাদের সূর্য তারার জগতে বেশ ছোট খাট। তবে সান্তনার কথা হল তার থেকেও বেটে আছে K, M তারা।

আমাদের সূর্যের হাইড্রোজেন ফিউসান যখন শেষ হয়ে যাবে, তারপর হিলিয়াম ফিউসান শুরু হবে। তখন এটা ফুলে আয়তনে বেড়ে যাবে। এর নাম হবে red giant (লাল দৈত্য)। বাইরের উষ্ণ দিকটা লাল দেখাবে। এরপর এটা ঠাণ্ডা হয়ে ছোট হতে থাকবে। সেই সময় এটা পৃথিবীর সমান আকৃতি নেবে। অবশ্য সূর্য যখন ফুলে উঠেছে. তখন পৃথিবী পুড়ে গেছে। যাই হোক, এই অবস্থাকে বলে সাদা বামন (white dwarf) এর থেকে উত্তাপ বিকিরত হতে হতে, ছোটো ও কালো হয়ে যাবে। তখন একটা কালো বামন বা black dwarf এ পরিণত হবে।

সূর্যের ব্যাপার এরকম। কিন্তু বড় বড় তারার গল্প আরও চমকপ্রদ।

সংখ্যা এল যেমন করে

গোপাল চক্রবর্তী

কট্টর জড়বাদী দার্শনিক দিদেরো একবার রাশিয়ায় জারের সভায় গিয়ে তখনকার রাশিয়ান পণ্ডিত সমাজকে যখন নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে, সেই সময়ে আস্তিক পণ্ডিত সমাজকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত গণিতবিদ অয়লার। তিনি দিদেরোকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। দিদেরোর প্রচণ্ড আস্থা নিজের যুক্তি তর্কের ওপর। তাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন অয়লার-এর আহ্বান।

অয়লার এলেন এবং প্রথমেই দিদেরো-কে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরভাবে বললেন,

$\frac{a + b^n}{n} = x$, done dieu exite, Respondez !

অর্থাৎ $\frac{a + b^n}{x} = x$, অতএব ঈশ্বর আছেন, আপানার কিছু বক্তব্য আছে !

না, দিদেরোর কোনো বক্তব্য ছিল না। তিনি যুক্তিবাদী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিন্তু অংক জানতেন না একেবারেই। তাই বুঝতে পারেন নি অয়লার যা বলেছেন তা কোনো প্রমাণ নয়। শুধু মাত্র হিং টিং ছট ছড়া। দিদেরোর হার হল শুধুমাত্র অংকের ভাষা না জানার জন্য।

গল্প তো হল, কিন্তু অংক কি ? উত্তর তার, অংক হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যার কারবার সংখ্যা, রাশি, বিন্যাস নিয়ে এবং নিয়ম মেনে। এককথায় অংক হচ্ছে 'অন্ধকারে লুকানো বস্তু জানার নিয়ম'। অংক একটা ভাষা। যে ভাষাটি ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞানের সব কটি শাখাতেই সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। অংকের জ্ঞান ছাড়া আমাদের বর্তমান জীবন ধারণ পদ্ধতি অসম্ভব। অংক ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞান পঙ্গু, মানব সভ্যতা অচল।

আমাদের চারদিকে সংখ্যার ছড়াছড়ি। কত টাকা ? কটা বাজে ? কত দাম ? বাড়ির বা টেলিফোন নাম্বার কত ? এসব তো প্রাত্যহিক ব্যাপার। এখানে ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধার্মিক-অধার্মিক সবাই সমান। সকলেই সংখ্যার পূজারী। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তের প্রতিটা পদক্ষেপ পড়ে সংখ্যার সাহায্যে অংকের রাজত্বে। তবে অংক মানে শুধু কতকগুলো সংখ্যার হিজিবিজি নয়, নয় কোনো পাগলের পাগলামি। অংক মানে সমন্বয় যা এলোমেলো ব্যাপারগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে আমাদের বোঝায় সাহায্য করে।

সব কিছুর পেছনেই থাকে কার্যকারণ, যাকে বলে ইতিহাস। অংকও তার ব্যতিক্রম নয়, যদিও প্রমাণের স্বল্পতার জন্য তা দারুণভাবে স্পষ্ট নয়। তবুও বলা যায় ভাষার মতো অংকেরও সৃষ্টি অভাব বোধের প্রেরণায়, প্রয়োজনের তাগিদে। প্রথম সৃষ্টি সংখ্যা, সেই তার বর্ণমালা।

সংখ্যা কি ? এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অথচ মজার ব্যাপার, সংখ্যা ধরে নিয়ে জগৎ সংসার দিব্যি চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে সেই আদিম কাল থেকেই। কারণ অংক অচল, স্থির নয়।

কিন্তু সংখ্যা এল কিভাবে ?

বলা মুস্‌কিল। তবে এটা ঠিক, মানুষের বাস্তব প্রয়োজনই সংখ্যা উদ্ভবের জন্য দায়ী।

আদিম মানুষেরা তাদের জিনিসপত্র বা শিকার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে গিয়ে হঠাৎই সংখ্যার ধারণা করে বসে। কটা পশু, কটা অস্ত্র, কজন মানুষ আছে তাদের দলে — এসব প্রশ্ন গুহাবাসী মানুষের মনে সেই সময়েই গণনার বোধ জন্মে দেয়। কোনো হিংস্র বন্যপ্রাণী গৃহপালিত প্রাণীকে মারলে, প্রাণীর সংখ্যা কমে। আবার

নতুন শাবক জন্মালে প্রাণীর সংখ্যা বাড়ে। এসব হিসাব রাখতে গিয়েই সেই আদ্যিকালের যোগ বিয়োগের সূচনা।

কিন্তু হিসাব রাখবে কিভাবে ?

কেন, সঙ্গেই তো আছে হাত আর পা-এর একুনে কুড়িটা আঙুল। যে ব্যক্তি প্রথম বুঝতে পারে হাত আর পা-এর এই আঙুলগুলিই গণনার জন্য দারুণ সুন্দর, সহজলভ্য যন্ত্র, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সমসাময়িক কালে অসাধারণ গুণশীল ব্যক্তি ছিলেন।

বস্তুত পক্ষে গণনাই গণিতের শুরু। তারপর গঙ্গা-পদ্মা - ভোলগা - - - দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। গণনা পদ্ধতি বহু সহস্র বছর ধরে ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে নিয়েছে নতুন থেকে নতুনতর ভাবে। আর তার হাত ধরে অংক হামাগুড়ি দিতে দিতে, টালমাটাল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এবং তারপর বড় হয়ে আজ পক্ষীরাজ চেপে দিগ্বিজয় করছে।

প্রাথমিক স্তরে দেয়ালে ঢেড়া কেটে বা প্যাপিরাসের পাতায় আঁচড় কেটে গণনা করা হোত। যদিও সংখ্যার ভাষা তারা জানত না তবুও আমাদের সেই পূর্বপুরুষরা আঁচড় দেখে বা দেখিয়ে বলতে বা বোঝাতে পারত — "কত - - - - - -"।

ধীরে ধীরে বহু অভিজ্ঞতায়, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন মিশরীয় এবং তারপর গ্রীক ও রোমানরা আরও সুন্দর, ছন্দযুক্ত এবং সুশৃংখল সংখ্যা পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। মাটির প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এল হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি। যদিও আরব থেকেই এই পদ্ধতি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে তবুও প্রকৃত পক্ষে বেশীরভাগ বিদগ্ধ পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষই এই পদ্ধতির সূতিকাগৃহ। আর আজ তো ভারতবর্ষ বিশ্বস্বীকৃত সংখ্যার রাণী শূন্যের আবিষ্কর্তা হিসাবে। তবে আরবরাই প্রথম ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব আর গ্রীক জ্যামিতির সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারার মিলন ঘটিয়ে নতুন পাটীগণিত সৃষ্টি করেন।

তারপর ? সে তো বিরাট ইতিহাস। জটিল বিশ্বের জটিলতা দূর করতে এক এক করে এল এ্যালজেব্রা, পরিমিতি, কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি, ত্রিকোনোমিতি, লগারিদম, বাইনারী, বাইনোমিয়েল থিয়োরেম, মেট্রিক্স, বুলিয়েন এ্যালজেব্রা, - - - - - ইত্যাদি। মানব সভ্যতাও এগিয়ে চলেছে টগবগিয়ে - - - -।

'শূন্য' থেকে 'একে শূন্য'। তারপর শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন - - - -। কিন্তু মূল ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ - এই দশটি সংখ্যার সাহায্যেই গড়ে উঠল সংখ্যা রাশির হিমালয়। সংখ্যার পরিবারে ঢোকার আগে তাই কর্তাদের পরিচয়টা একটু জেনে নেওয়া যাক।

সংখ্যা — এক (১) ঃ

সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রথম ধাপেই আমরা শিখি এক এ চন্দ্র অর্থাৎ একটি চাঁদ। পৃথিবীর উপগ্রহ একটিই এবং তা আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী কল্পলোকের চাঁদমামা। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাই প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদগণ ১ সংখ্যা বোঝাতে চাঁদকে বা তার বিভিন্ন প্রতিশব্দকে আঙ্কিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১ এর আরো অনেক আঙ্কিক নাম পাওয়া যায়। যেমন — ভূ (পৃথিবী - একটিই) বা ভূ-এর বিভিন্ন প্রতিশব্দ।

এই সংখ্যাটিই ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতির বুনিয়াদ। সংখ্যা জগতে 'এক'-ই বহুরূপে কোটি কোটি সংখ্যায় বিরাজমান। অর্থাৎ 'এক' থেকেই অনেক এবং অনেকের মধ্যেই 'এক'।

১ সংখ্যাটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে '১' দ্বারা যে কোনো সংখ্যাকেই গুণ বা ভাগ করা যাক না কেন, ফলাফলে সেই সংখ্যাটিই থাকে। ১ ঘরের নামতার প্রথম নটা ঘরে কোন নতুনত্ব নেই, কিন্তু তারপরেই মজাদার চিত্র ফুটে উঠবে।

মূল গুণফল	মজার গুপ্তকথা
১০ × ১ = ১০	১ + ০ = ১
১১ × ১ = ১১	১ + ১ = ২
১২ × ১ = ১২	১ + ২ = ৩
১৩ × ১ = ১৩	১ + ৩ = ৪
১৪ × ১ = ১৪	১ + ৪ = ৫
১৫ × ১ = ১৫	১ + ৫ = ৬

১৬ × ১ = ১৬	১ + ৬ = ৭
১৭ × ১ = ১৭	১ + ৭ = ৮
১৮ × ১ = ১৮	১ + ৮ = ৯

ইত্যাদি।

১ এর যত ঘাতই করা হোক না কেন, ফলাফলে সবেধন নীলমণি সেই ১ পাব। যেমন — $১^{৯৫\ ৬৩৪} = ১$, বা $\sqrt[৩]{১} = ১$, $\sqrt[২৪৪]{১} = ১$,

শূন্য বাদে, যে কোন সংখ্যার শূন্য ঘাত এর ফলও সেই ১। যেমন — $৫^{০} = ১$, $৫৬৯৩^{০} = ১$, $ক^{০} = ১$ ইত্যাদি।

১-এর চেয়ে বড় সংখ্যার যে কোন ঘাত মূল সংখ্যা অপেক্ষা বড় হয়। কিন্তু ০ অপেক্ষা বড় এবং ১ অপেক্ষা ছোট যে কোন সংখ্যার যে কোনো খাত মূল সংখ্যা অপেক্ষা ছোট। যেমন — $৫^{৫} = ১২৫$, $(১/২)^{৫} = ১/৮$

আবার ১ অপেক্ষা বড় যে কোনো আলাদা দুটি সংখ্যার গুণফল ঐ সংখ্যা দু'টির যে কোনোটি থেকে বড় এবং ১ অপেক্ষা ছোট কিন্তু ০ অপেক্ষা বড় যে কোনো দু'টি সংখ্যার গুণফল ঐ সংখ্যা দু'টির যে কোনোটির চেয়ে ছোট।

অর্থাৎ ১ সংখ্যাটি তার চেয়ে বড় ও ছোট সংখ্যাগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রভেদ রেখা টানে।

সংখ্যা — দুই (২) ঃ

২ - এ পক্ষ অর্থে পাখীর দু'টি ডানা (পক্ষ) এবং শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ উভয়কেই বোঝায়। পক্ষবোধক শব্দ ছাড়া ২ এর আঙ্কিক শব্দ হিসেবে ওষ্ঠ (দু'টি ঠোঁট), জানু, কর (হাত) ইত্যাদিরও ব্যবহার আছে।

২ দ্বারা কোনো সংখ্যাকে গুণ করার অর্থ ঐ সংখ্যাকে দু'বার লিখে যোগ করা। বিভিন্ন সংখ্যাকে ২ দ্বারা যতদূর সম্ভব গুণ কর না কেন, গুণফলের লুকানো অংশে বারবার ২, ৪, ৬, ৮, ১, ৩, ৫, ৭ এবং ৯ - এই নয়টি সংখ্যাই বারবার ফিরে আসবে।

১৯ × ২ = ৩৮	৩ + ৮ = ১১	১ + ১ = ২
২০ × ২ = ৪০	—	৪ + ০ = ৪
২১ × ২ = ৪২	—	৪ + ২ = ৬
২২ × ২ = ৪৪	—	৪ + ৪ = ৮
২৩ × ২ = ৪৬	৪ + ৬ = ১০	১ + ০ = ১
২৪ × ২ = ৪৮	৪ + ৮ = ১২	১ + ২ = ৩
২৫ × ২ = ৫০	—	৫ + ০ = ৫
২৬ × ২ = ৫২	—	৫ + ২ = ৭
২৭ × ২ = ৫৪	—	৫ + ৪ = ৯
২৮ × ২ = ৫৬	৫ + ৬ = ১১	১ + ১ = ২

যে কোনো জোড় সংখ্যাকে এবং কোনো সংখ্যার শেষে এক বা একাধিক শূন্য থাকলে তাকে ২ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

সংখ্যা — তিন (৩) ঃ ছোট বেলায় এক -এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষের পরেই ধারাপাত বইতে পড়েছি তিন-এ নেত্র অর্থাৎ নয়ন বা চোখ। অথচ আমাদের চোখ দু'টো। তাহলে ? আসলে এর উৎপত্তি পুরান কল্পিত শিবনেত্র থেকে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দৃষ্টি। এ ছাড়াও গণিতে ৩ সংখ্যার আঙ্কিক শব্দ হিসেবে গুণ (সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্), লোক (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল), কাল (ত্রিকাল), রাম (পরশুধর রাম, ধনুর্ধর রাম, হলধর রাম) ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

তিন সংখ্যাটির সর্ব প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে ৩-ই হচ্ছে প্রথম সংখ্যা, যা দিয়ে ত্রিভুজের কল্পনা করা যায়। এটা একটা মৌলিক সংখ্যাও বটে।

মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা যাকে ১ ও সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না। ৩ এর পরবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলি হল ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭ ইত্যাদি।

৩ দ্বারা গুণের ক্ষেত্রে দেখা যায় —

১৮ × ৩ = ৫৪		৫ + ৪ = ৯
১৯ × ৩ = ৫৭	৫ + ৭ = ১২	১ + ২ = ৩
২০ × ৩ = ৬০		৬ + ০ = ৬
২১ × ৩ = ৬৩		৬ + ৩ = ৯
২২ × ৩ = ৬৬	৬ + ৬ = ১২	১ + ২ = ৩

এভাবে যে কোনো সংখ্যাকেই ৩ দ্বারা গুণ করা যাক না কেন, যদি গুণফলের অন্তর্গত সংখ্যাগুলিকে যোগ করে যোগফল এক অংকের সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় তবে ৩, ৬, ৯ - এই তিনটি সংখ্যাই ফিরে ফিরে আসবে। এই তিনটি সংখ্যাই ৩ দ্বারা বিভাজ্য। আর এটাই ৩ দ্বারা ভাগ করার গোপন পথ। কোনো সংখ্যার অন্তর্গত অঙ্কগুলির যোগফল যদি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে ঐ সংখ্যাটিও ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

সংখ্যা — চার (৪) ঃ

৪-এই সংখ্যাটির পরিচিত আঙ্কিক শব্দ বেদ (ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব), যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) ইত্যাদি।

৪ দ্বারা গুনের সময় লুকানো অংশে মানের অধঃক্রম অনুসারে দু'টি আলাদা স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়।

৭২ × ৪ = ২৮৮	২ + ৮ + ৮ = ১৮	১ + ৮ = ৯
৭৩ × ৪ = ২৯২	২ + ৯ + ২ = ১৩	১ + ৩ = ৪
৭৪ × ৪ = ২৯৬	২ + ৯ + ৬ = ১৭	১ + ৭ = ৮
৭৫ × ৪ = ৩০০		৩+০+৩ = ৩
৭৬ × ৪ = ৩০৪		৩+০+৪ = ৭
৭৭ × ৪ = ৩০৮	৩ + ০ + ৮ = ১১	১ + ১ = ২
৭৮ × ৪ = ৩১২		৩+১+২ = ৬
৭৯ × ৪ = ৩১৬	৩ + ১ + ৬ = ১০	১ + ০ = ১
৮০ × ৪ = ৩২০		৩+২+০ = ৫

ইত্যাদি। ৪ সংখ্যাটি হচ্ছে একটি বর্গ সংখ্যা। প্রথম বর্গ সংখ্যাটি অবশ্যই ১। পরের বর্গ সংখ্যাগুলি হল ৯, ১৬, ২৫ ইত্যাদি।

৪ = ১ × ২ × ২

সুতরাং কোনো সংখ্যাকে দু'বার ২ দ্বারা ভাগ করা গেলে অর্থাৎ কোনো সংখ্যাকে যদি প্রথমে ২ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার ২ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় অথবা কোনো সংখ্যার শেষে যদি একাধিক শূন্য থাকে তবে ঐ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

সংখ্যা — পাঁচ (৫) ঃ পাঁচ এ পঞ্চবান। গণিতে পাঁচ-এর আঙ্কিক শব্দ হিসেবে ঈন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পাণ্ডব, বট ইত্যাদি প্রচলিত।

৫ সংখ্যাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এটি ১০ এর অর্দ্ধেক — যা তাড়াতাড়ি গুণ বা ভাগ করার সহায়ক সংখ্যা।

১, ২, ৩ এবং ৫ এই প্রথম চারটি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে মজাদার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

১৫৩ = $১^৩ + ৫^৩ + ৩^৩$

৩ = $২^২ - ১^২$

৫ = $৩^২ - ২^২$

৫ সংখ্যাটির দ্বারা গুণে লুকানো অংশটি ৪ দ্বারা গুণের মতোই, শুধু মাত্র এখানে সংখ্যার অধঃক্রমের জায়গায় উর্দ্ধক্রম হবে।

৫ × ১ = ৫		১ + ০ = ১
৫ × ২ = ১০		১ + ৫ = ৬
৫ × ৩ = ১৫		২ + ০ = ২
৫ × ৪ = ২০		২ + ৫ = ৭
৫ × ৫ = ২৫		৩ + ০ = ৩
৫ × ৬ = ৩০		৩ + ৫ = ৮
৫ × ৭ = ৩৫		৪ + ০ = ৪
৫ × ৮ = ৪০		৪ + ৫ = ৯
৫ × ৯ = ৪৫		৫ + ০ = ৫
৫ × ১০ = ৫০		
৫ × ১১ = ৫৫	৫ + ৫ = ১০	১ + ০ = ১
৫ × ১২ = ৬০		৬ + ০ = ৬
৫ × ১৩ = ৬৫	৬ + ৫ = ১১	১ + ১ = ২

ইত্যাদি।

কোনো সংখ্যার শেষে ৫ অথবা ০ থাকলে সংখ্যাটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

সংখ্যা — ছয় (৬) ঃ ছয়-এ ঋতু, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এছাড়া অর্থবোধক অন্যান্য আঙ্কিক শব্দ অরি, কারক ইত্যাদি।

এই সংখ্যাটি অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এটি ৩ এর পরবর্তী ত্রিভুজ সংখ্যা এবং প্রথম আদর্শ সংখ্যা।

আদর্শ সংখ্যা বলতে সেই সংখ্যাকে বোঝায় যা ঐ সংখ্যাটি ছাড়া তার আর সমস্ত উৎপাদকের যোগফলের সমান।

যেমন — ১ + ২ + ৩ = ৬

আবার দেখ ১ × ২ × ৩ = ৬

৬ এর যে কোনো ঘাতের শেষ অঙ্কটিও ৬। যেমন - $৬^৪$ = ১২৯৬, $৬^৭$ = ২৭৯৯৩৬ ইত্যাদি। আবার এমন কতকগুলো সংখ্যা আছে যাদের ৬ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের অন্তর্গত অংকগুলোর যোগফল ৬ হয়। যেমন-

৪ × ৬ = ২৪ ২ + ৪ = ৬

৭ × ৬ = ৪২ ৪ + ২ = ৬

২২ × ৬ = ১৩২ ১ + ৩ + ২ = ৬ ইত্যাদি।

৬ দ্বারা গুণে গুণফলের লুকানো অংশটি ৩ দ্বারা গুণের মতোই। তবে ৩ দ্বারা গুণে যেমন ৯, ৩, ৬ এসেছিল এখানে পরপর বারবার আসবে ৬, ৩, ৯।

সংখ্যা — সাত (৭) ঃ বাংলা ধারাপাতে আছে সাত-এ সমুদ্র (দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদুদক)। গণিতে ৭-এর আঙ্কিক শব্দ হিসেবে মুনি, শৈল, স্বর ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।

কোনো সংখ্যা ৭ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা জানার কোনো সহজ নিয়ম নেই।

৭ এবং ১৪২৮৫৭ সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক দেখা যায়। 'এক' থেকে 'ছয়' পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যার হর যদি ৭ হয় তবে তাদের তুল্যমান দশমিকগুলো বিশুদ্ধ আবৃত্ত (পর্যায়ক্রমে পরপর ফিরে আসা) দশমিক হয় এবং আবৃত্তাংশে ১, ৪, ২, ৮, ৫, ৭ এই অঙ্কগুলোই থাকে। ১, ২, ৪, ৫, ৭ ও ৮ থেকে আরম্ভ করে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে ঘুরলে (৬টি করে অংক) যথাক্রমে ১/৭, ২/৭, ৩/৭, ৪/৭, ৫/৭ ও ৬/৭ এর আবৃত্ত দশমিক পাওয়া যায়।

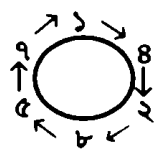

আবার দেখ,

১৪২৮৫৭ × ৭ = ৯৯৯৯৯৯

৭ গুণের সময় লুকানো অংশে আমরা বারবার পর্যায়ক্রমিকভাবে ৭, ৫, ৩, ১, ৮, ৬, ৪, ২, ৯ অংকগুলিই পাব।

সংখ্যা — আট (৮) ঃ আট-এ অষ্টবসু (আপ, ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস)। এছাড়া ৮-এর আঙ্কিক শব্দ গজ-ও প্রচলিত।

কোনো সংখ্যা তিনবার ২ দ্বারা বিভাজ্য হলে অথবা সংখ্যাটির শেষে তিন বা ততোধিক শূন্য থাকলে সংখ্যাটি ৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

আটবার ৮ নিয়ে একটা মজার যোগ লক্ষ কর —

৮৮৮ + ৮৮ + ৮ + ৮ + ৮ = ১০০০

৮ দ্বারা গুণের লুকানো অংশটি ১ দ্বারা গুণের বিপরীত। আর একটা মজার গুণ দেখ —

১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২১

সংখ্যা — নয় (৯) ঃ নয়-এ নবগ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো)। গণিতে ৯ বোঝাতে আর যে সব আঙ্কিক শব্দ প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে অংক (১ থেকে ৯), শুক্র নন্দ, গ্রহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১ থেকে ১০ পর্যন্ত দশটি সংখ্যাকেই ৯ দ্বারা গুণ করলে মজার ছন্দ পরিলক্ষিত হয়।

	দশকের ঘর	এককের ঘর
১ × ৯ = ০ ৯		
২ × ৯ = ১ ৮	০	৯
৩ × ৯ = ২ ৭	↓	↑
৪ × ৯ = ৩ ৬	৯	০
৫ × ৯ = ৪ ৫		
৬ × ৯ = ৫ ৪		
৭ × ৯ = ৬ ৩		
৮ × ৯ = ৭ ২		
৯ × ৯ = ৮ ১		
১০ × ৯ = ৯ ০		

অর্থাৎ দশকের ঘরে ০ থেকে নীচের দিকে পরপর বাড়তে বাড়তে ৯ পর্যন্ত হচ্ছে এবং এককের ঘরে এর বিপরীত ক্রম হচ্ছে।

যে কোন সংখ্যাকে ৯ দ্বারা গুণ করে, গুণফলের অন্তর্গত সবকটি অংককে যোগ করে শেষ পর্যন্ত এক অংকের সংখ্যায় প্রকাশ করলে সবসময় ৯ পাওয়া যায়।

উদাহরণ —

১১×৯=৯৯	৯+৯=১৮	১ + ৮=৯
১২×৯=১০৮		১+০+৮=৯
৪৭×৯=৪২৩		৪+২+৩=৯
১৫৪×৯=১৩৮৬	১+৩+৮+৬=১৮	১+৮=৯

এটাই ৯ দ্বারা ভাগের গোপন মন্ত্র। কোনো সংখ্যার অন্তর্গত অংকগুলোর সমষ্টি ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে, সংখ্যাটিও ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে। সুতরাং কোনো সংখ্যাকে ৯ দ্বারা ভাগ না করেই বলে দেওয়া যাবে ভাগশেষ হিসেবে কত পাব।

যেমন, ১৫৯৭২ সংখ্যাটির অন্তর্গত অংকগুলোর সমষ্টি = ১ + ৫ + ৯ + ৭ + ২ = ২৪, এখন ২৪ ÷ ৯ করলে ভাগশেষ থাকে ৬, অথবা ২৪ এর অন্তর্গত ২ ও ৪ এর যোগফল ৬। সুতরাং ১৫৯৭২ কে ৯ দ্বারা ভাগ করলে ৬ ভাগশেষ থাকবে।

যে কোনো সংখ্যাকে উল্টিয়ে বড় থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে। কারণ সব সময় বিয়োগ ফলের অন্তর্গত অংকগুলোর সমষ্টি এক অংকের সংখ্যায় করলে সব সময় ৯ হবে।

উদাহরণ ঃ ৩৭০৫৬ কে উল্টিয়ে লিখলে পাই ৬৫০৭৩,

এখন, ৬৫০৭৩ - ৩৭০৫৬ = ২৮০১৭

এবার দেখ, ২ + ৮ + ০ + ১ + ৭ = ১৮, ১ + ৮ = ৯

আবার যে কোনো সংখ্যার অন্তর্গত অংকগুলোর মূল সমষ্টি, সংখ্যাটি থেকে বিয়োগ করলেও উপরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ — ৪৬৩৮৭ সংখ্যাটির অন্তর্গত অংকগুলোর সমষ্টি = ৪ + ৬ + ৩ + ৮ + ৭ = ২৮,

সুতরাং ৪৬৩৮৭
— ২৮
৪৬৩৫৯ ৪ + ৬ + ৩ + ৫ + ৯ = ২৭,
২ + ৭ = ৯

অথবা ৪৬৩৮৭ [২৮ এর জন্য ২ + ৮ = ১০]
— ১০
৪৬৩৭৭ ৪ + ৬ + ৩ + ৭ + ৭ = ২৭,
২ + ৭ = ৯

কিংবা ৪৬৩৮৭ [১০ এর জন্য ১ + ০ = ১]
— ১
৪৬৩৮৬ ৪ + ৬ + ৩ + ৮ + ৬ = ২৭,
২ + ৭ = ৯

আরো মজা চাও ?

১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ = ১১১ ১১১ ১১১

অথবা $০.৯ = \frac{৯ - ০}{৯} = \frac{৯}{৯} = ১$

মৌলিক পদার্থের খুঁটিনাটি

অসীম কুমার হালদার

ক্রমিক সংখ্যা	মৌলের নাম	প্রতীক চিহ্ন	আইসোটোপের সংখ্যা	পারমানবিক সংখ্যা	যোজ্যতা
১।	অ্যালুমিনিয়াম	Al	5	13	3
২।	অ্যাকটিনিয়াম	Ac	7	89	3
৩।	অ্যামরিসিয়াম	Am	6	95	3, 4, 5, 6
৪।	অ্যান্টিমনি	Sb	21	51	3,5
৫।	আর্গন	Ar	5	18	0
৬।	আর্সেনিক	As	10	33	3,5
৭।	অ্যাস্টেটাইন	At	10	85	1,5
৮।	বেরিয়াম	Ba	19	56	2
৯।	বার্কেলিয়াম	Bk	1	97	3,5
১০।	বেরিলিয়াম	Be	4	4	2
১১।	বিসমাথ	Bi	13	88	3,5
১২।	বোরন	B	3	5	3
১৩।	ব্রোমিন	Br	15	35	1,3,5,7
১৪।	ক্যাডমিয়াম	Cd	16	48	2
১৫।	ক্যালসিয়াম	Ca	6	20	2
১৬।	ক্যালিফোর্নিয়াম	Cf	1	98	3
১৭।	কার্বন	C	5	6	2,4
১৮।	সিরিয়াম	Ce	12	58	3,4
১৯।	সিজিয়াম	Cs	16	55	1
২০।	ক্লোরিন	Cl	7	17	1,3,5,7
২১।	ক্রোমিয়াম	Cr	7	24	2, 3, 6
২২।	কোবাল্ট	Co	9	27	2, 3
২৩।	কপার	Cu	11	29	1,2
২৪।	কিউরিয়াম	Cm	4	96	3
২৫।	ডিস্প্রেসিয়াম	Dy	10	66	3
২৬।	এরবিয়াম	Er	11	68	3
২৭।	ইউরোপিয়াম	Eu	12	63	3
২৮।	ফ্লোরিন	F	4	9	1,7
২৯।	ফ্রান্সিয়াম	Fr	5	87	1
৩০।	গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	11	64	3

পারমানবিক ওজন	আবিষ্কার কর্তার নাম	নাগরিকত্ব	সাল	নামের উৎস বা অর্থ	ধাতু/অধাতু
26.79	ওরস্টেড	ড্যানিশ	১৮২৫	অ্যালাম অর্থ ফটকিরি	ধাতু
227	ডেবিয়ের্ন	ফরাসী	১৮৯৯	রশ্মিগুচ্ছ বা রশ্মি	ধাতু
241	সিবোর্জ, জেমস্ মর্গ্যান, ঘিওরোসো	সকলেই আমেরিকান	১৯৪৪	অ্যামেরিকানা হইতে উৎপন্ন	ধাতু
121.76	থোল্ড (ভ্যালেন্টাইন)	জার্মান	১৪৫০	স্টিবিয়াম হইতে গৃহীত	ধাতু
39.944	র‍্যাল, র‍্যামেজ	ইংরেজ	১৮৯৪	অর্থ নিষ্ক্রিয়	অধাতু
74.91	অ্যালবার্টস ম্যাগ্‌নাস	জার্মান	১২৫০	আর্সেনিকাম হইতে গৃহীত	,,
211.00	কর্সন, ম্যাকেঞ্জি, সেগ্রি	১ম, ২য় আমেরিকান ৩য় ইটালীয়ান	১৯৪০	অস্থায়ী হ্যালোজেন	,,
137.36	ডেভি	ইংরাজ	১৮০৮	Heavy অর্থাৎ ভারী	ধাতু
243	থমসন, সিবোর্জ, ঘিওরোসো	সকলেই আমেরিকান	১৭৪৯	বার্কেলি-ক্যালিফোর্নিয়া	,,
9.02	ভ্যাকুরেলিন	ফরাসী	১৯৭৮	মিষ্ট	,,
209.00	জিয়োফ্রয়	,,	১৭৫৩	সাদা বস্তু	,,
10.82	ডেভি, গে-লুসাক, থেনার্ড	ইংরেজ, ফরাসী, ফরাসী	১৮০৮	বুরাক শব্দ হতে গৃহীত	অধাতু
70.916	ব্যালার্ড	ফরাসী	১৮২৬	পচা দুর্গন্ধ	,,
112.41	স্ট্রোমেয়ার	জার্মান	১৮১৭	Earth বা মাটি	ধাতু
40.08	বার্জিলাস পনটিন, ডেভি	সুইডিশ	১৮০৮	লাইম অর্থাৎ চুন	,,
244	থমসন, স্ট্রীট, ঘিওরোসো, সিবোর্জ	সকলেই আমেরিকান	১৯০৫	ক্যালিফোর্নিয়া থেকে গৃহীত	,,
12.01	নাম পাওয়া যায় না	—	খৃষ্টপূর্বাব্দ	কার্বো থেকে গৃহীত	অধাতু
140.13	ক্ল্যাপ্রথ, হিসিনজার, বার্জেলিয়াস	জার্মান, সুইডিশ, সুইডিশ	১৮০৩	সিরেস থেকে গৃহীত	ধাতু
132.91	বুনসেন, কার্সফ	জার্মান	১৮৬০	স্কাই-ব্লু-আকাশি নীল	,,
35.457	শীলি	সুইডিশ	১৭৭৪	সবুজাভ হলুদ	অধাতু
52.01	ভ্যাকুয়েলিন	ফরাসী	১৭৯৮	Chrom থেকে গৃহীত	ধাতু
58.94	ব্র্যাণ্ড	সুইডিশ	১৭৩৫	Cobaltum থেকে গৃহীত	,,
63.54	নাম পাওয়া যায় না	—	খৃষ্টপূর্বাব্দ	Cuprum ,, ,,	,,
242	সিবোর্জ, জেম্‌স, ঘিওরোসো	সকলেই আমেরিকান	১৯৪৪	Curie অর্থাৎ কিউরি	,,
162.46	লেরোক ডিবসবাউড্রান	ফরাসী	১৮৮৬	Hard to get at সহজ লভ্য নয়	
167.2	মোসাণ্ডার	সুইডিশ	১৮৪৩	সুইডেনের Ytterby নামক শহরের নাম থেকে গৃহীত	,,
152	ডেমার্ক	ফরাসী	১৯০১	Europe শব্দ থেকে গৃহীত	,,
19.00	শীলি	সুইডিশ	১৭৭১	To flow অর্থাৎ বহমান	অধাতু
223	পেরে, মারগুয়েরাইট	ফরাসী	১৯৩৯	France-এর নাম থেকে গৃহীত	ধাতু
156.90	মারিগনাক	সুইডিশ	১৮৮০	রসায়নবিদ জন গ্যাডোলিং এর নামানুসারে	

বিজ্ঞানের খবরাখবর

দীপা সরকার

অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের নতুন বিকল্প ব্যবস্থা

লিউকিমিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য এক অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও উন্নত বিকল্প পাওয়া গেছে। সদ্যপ্রসূত শিশুর সঙ্গে মায়ের শরীর থেকে পাওয়া যায় নাভিরজ্জু বা নাড়ী ও গর্ভফুল। এর মধ্যে থাকে রক্ত। এই রক্তকে অস্থিমজ্জার পরিবর্তে ব্যবহার করা হবে।

আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞ ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জিল হাউস (Jill Hows) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই রক্ত যদি সদ্য জন্ম নেওয়া সুস্থ শিশুর নাড়ী থেকে নিয়ে লিউকিমিয়া রোগীর শরীরে ব্যবহার করা হয়, তবে ভাইরাসহীন এই রক্ত তাড়াতাড়ি রোগীর রক্তে লোহিতকণিকা তৈরীতে সাহায্য করে। ব্রিটেনের লিউকিমিয়া গবেষণা তহবিল এই গবেষণার কাজে ৫২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন। এই টাকা দুইভাবে ব্যবহার করা হবে। পশ্চিম ইংলণ্ডের শহর ব্রিস্টলে অবস্থিত সাউথমিড হাসপাতালে নাভিরজ্জু ও গর্ভফুল থেকে সংগ্রহ করা রক্তের একটি ব্যাঙ্ক তৈরী করা হবে ও বাকী অর্থে এই সংক্রান্ত আরো গবেষণা হবে।

ভারতে প্রস্তুত হেপাটাইটিস — বি টিকা

প্রায় ৪৫০ লক্ষ ভারতবাসীর শরীরে এখন হেপাটাইটিস — বি'র ভাইরাস বাস করছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতি বছর ৭৫০ লক্ষ হেপাটাইটিস - বি এর টিকা দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এখন বিদেশ থেকে আমদানী করা দামী টিকা ব্যবহার করা হচ্ছে। তা শুধু স্বল্পসংখ্যক ভারতবাসীই কিনতে পারে। তবে খুব শিগগীরই এ অবস্থার পরিবর্তন হতে চলেছে। ভারতে এই টিকা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইন্সটিটিউট ও মুম্বাই-এর কে. ই. এম হাসপাতালে রোগীদের উপর পরীক্ষা করে শতকরা একশোভাগ সাফল্য পাওয়া গেছে। ভারতের বাজারে এই টিকার দাম হবে প্রতিটি ডোজ ৭৫ টাকা। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং দ্বারা প্রস্তুত এই টিকা তৈরী করেছেন হায়দ্রাবাদের শান্তা বায়োটেকনিক্স্ প্রাইভেট লিমিটেড্। তাঁরা প্রাথমিকভাবে ১২ কোটি টাকা এই কাজে ব্যয় করেছেন এবং ভারত সরকারের প্রযুক্তি উন্নয়ন দপ্তর তাঁদের ৩ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। অন্যান্য কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও ভারতবর্ষে হেপাটাইটিস - বি টিকা প্রস্তুত করবার জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন। প্রাথমিক প্রয়াসে বাজারে হেপাটাইটিস - বি টিকা যদি ৫০ লক্ষ ডোজ সরবরাহ করা হয়, তবে ভারতবর্ষের প্রায় ৩০০ লক্ষ ডলার মূল্যের বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে। এই হিসাব থেকে বোঝা যাবে, যদি ভারতের সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারে তবে বছরে কত বিদেশী মুদ্রা আমরা বাঁচাতে পারবো আর সাধারণ ভারতবাসীরা তো উপকৃত হবেই।

দূষণ রোধে ব্যাকটিরিয়া

সম্প্রতি আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মেমো-গাটেল (Maymo-Gatell) ও তাঁর সহকর্মীরা ষ্ট্রেন - ১৯৫ নামের একটি ব্যাকটিরিয়াকে আলাদা করতে পেরেছেন, যা শেষ পর্যন্ত পুকুর, নদী, কূপ ইত্যাদির জলকে দূষণমুক্ত রাখতে প্রভূত সাহায্য করবে। জলের দূষণ সৃষ্টি করে যে পারক্লোরোইথিলিন বা ছোট করে পি. সি. ই, তাকে সম্পূর্ণ ক্লোরিণ মুক্ত করে, দূষণহীন ইথিলিন যৌগিক রূপে পরিবর্তিত করবে এই ব্যাকটিরিয়া। জামাকাপড়, মেশিনপত্র, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার জন্য যে ক্লোরিণযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তা জলে মিশে এই দূষণ সৃষ্টি করে, আর ষ্ট্রেন - ১৯৫ ব্যাকটিরিয়া এই দূষিত ক্লোরিণের সংস্পর্শে এসেই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে আর জলকে পরিষ্কার করে দেয়। ফলে কারখানায় যদি এই ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করা হয় তবে

মেশিন ধোয়া জল দূষণমুক্ত অবস্থায় কারখানার বাইরে বেরিয়ে আসবে।

কারিপাতা ও সরষে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল

তিরুভানন্তপুরমে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকদল সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন, ভারতীয় রান্নায় যে কারিপাতা ও সরষে, ফোড়ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তার দ্বারা মানুষের শরীরের গ্রন্থি (Tissue)-কে মুক্ত পরমাণু গুচ্ছ (free radicals) থেকে বাঁচায়। এই মুক্ত পরমাণুগুচ্ছগুলি শরীরে রাসায়নিকভাবে সক্রিয় অবস্থায় থাকলে ডি. এন. এ (deoxyribo nucleic acid), কোষে অবস্থিত প্রোটিন ও কোষের ঝিল্লীতে থাকা স্নেহপদার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। তাই থেকে ক্যান্সার। হার্টের বাত ইত্যাদি রোগের বিপদ জনক আশঙ্কা থাকে। পরীক্ষাগারে কিছুদিন ধরে কিছু ইঁদুরের খাদ্যে শতকরা দশ ভাগ তাজা কারিপাতা ও গুঁড়ো সরষে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখলেন তারপর থেকে খুব বেশীমাত্রায় স্নেহপদার্থযুক্ত খাবার খেলেও তাদের দেহে মুক্ত পরমাণু গুচ্ছ তৈরী হচ্ছে না। অপরপক্ষে কারিপাতা ও সরষেবিহীন বেশী মাত্রায় স্নেহ পদার্থপূর্ণ খাদ্য কিছু ইঁদুরকে কিছুদিন খাওয়ানোর পর তাদের শরীরে কিছুটা মেদের আধিক্য ও শারীরিক ক্ষয় লক্ষ্য করা গেল।

ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ এক্স্পেরিমেণ্টাল বায়োলজি-তে এই বিষয়টা জানিয়েছেন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রী বীনা খান, অ্যানি আব্রাহাম ও এস. লীলাম্মা।

চাঁদের দেশে আবার পাড়ি

তবে এবার আর কোন মানুষকে পাঠানো হচ্ছে না। মানুষ শেষবার চাঁদের মাটিতে পা রেখেছে পঁচিশ বছর আগে। একটি রোবট এবার যাচ্ছে প্রধানতঃ চাঁদের মেরুপ্রদেশে জলের অস্তিত্ব আছে কিনা দেখার জন্য। চাঁদের জমি খুব এবড়ো খেবড়ো, বড় বড় ক্রেটার বা গর্তে ভর্তি। এইসব গর্তে হয়তো বরফের রূপে জল জমা হয়ে আছে। নাসা, (NASA) আমেরিকার এই বিখ্যাত সংস্থা যে রোবটকে পাঠাচ্ছে তার নাম প্রস্পেক্টর (Prospector) লম্বায় ৪ ফুট, ওজন ২৯৬ কেজি। একবছর ধরে এই সন্ধানী রোবটটি চাঁদের মেরু দেশের ১০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করে তার অনুসন্ধান কাজ চালাবে। অবশ্য গ্যাস জাতীয় ও খনিজ পদার্থ সন্ধান করার কাজও এই সঙ্গেই চলবে। এর আগে চাঁদের মাটিতে নেমে বেশ কিছু মহাকাশযাত্রী যন্ত্র পাথর, মাটি, বালি সংগ্রহ করে এনেছে। এইবার শুধু সমীক্ষা করার জন্যই ৬৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করে এই প্রসপেকটারকে পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞানীদের একটা পুরোনো প্রশ্নের জবাবও হয়তো এ থেকে মিলতে পারে। সেটা হল চাঁদের জন্ম হল কোথা থেকে ? বিজ্ঞানীদের অনুমান ৪ বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলগ্রহের আয়তনের সমতুল্য কোন মহাকাশবাসী বস্তুপিন্ড পৃথিবীকে ধাক্কা দিয়েছিল। তখনই পৃথিবীর একটা খণ্ড বিচ্যুত হয়ে চাঁদরূপে পৃথিবীকে আবর্তন করতে শুরু করেছে।

কিউই পাখী অবলুপ্তির পথে

সারা পৃথিবীতে নিউজিল্যাণ্ডের পরিচয় কিউই পাখীর নামে। সেই কিউই পাখির একটি প্রজাতি এখন পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার পথে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭, তারিখে জানিয়েছে যে, নিউজিল্যাণ্ডের নর্থ আইল্যাণ্ডের অধিবাসী, ব্রাউন কিউই পাখীর যত ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়, তারমধ্যে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ বাচ্চা বেঁচে থেকে বড় হয়। গত ১৫ বছরে এই প্রজাতির কিউই পাখীর সংখ্যা ৭০ হাজার থেকে কমে ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর যখন কিউই-এর ডিম ফুটে বাচ্চা জন্ম নেয়, তখন তার এক মাসের মধ্যেই অন্যান্য প্রাণীরা তাদের খেয়ে ফেলে। তাদের বাসস্থানের আয়তন ক্রমশঃ কমে আসছে, গাছপালা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিবছর অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ বাচ্চা কিউই যদি না বাঁচে, তবে আগামী ১৫ বছরে এদের সংখ্যা কমতে কমতে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও অন্যান্য জাতের কিউই পাখী, যেমন বড় ছিটওলা কিউই বা গ্রেট স্পটেড কিউই, আর দক্ষিণের ব্রাউন কিউই পাখীর সংখ্যা স্থিতিশীল। অর্থের অভাবেই নর্থ আই-ল্যাণ্ডের কিউই পাখীদের বাঁচানোর জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না।

আ লা প ন

ছোট্ট বন্ধুরা

দিন এগোয়, সময় তলে, বয়স বাড়ে। অথচ চারপাশটাকে চেনা হয়ে ওঠে কই ! ছোট বেলা থেকে ঠিকমতো দেখার চোক তৈরী করতে পারলে কতো কি জানতে পারি আমরা। এসো, দু একটা উদাহণ নিয়ে দেখি।

গাছ। আমাদের চারপাশে কতরকম গাছ। সকলের নাম জানি ? কোন গাছগুলো ওষধি ? কোন গাছে কখন ফুল ফোটে — দেখেছি কি ? কোন গাছ পর্ণমোচী, কেন হয় এই পত্রমোচন ? গাছের ফুল থেকে ধাপে ধাপে কেমন করে ফল হয় দেখেছি কি ? জানি কি কোন সব্জী বা ফল কত দিনে ফুল থেকে খাওয়ার মত অবস্থায় আসে ? কোন গাছগুলো লতানো, - লতানো গাছগুলোর কে কে ব্রততী (মাটিতে লতিয়ে চলে) আর কে কে আরোহী (কোন কিছুকে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে ওঠে) ? আরোহীদের মধ্যে কে বামাবর্তী আর কে বা দক্ষিণাবর্তী তা ও দেখেছি কি খুঁটিয়ে ? এই খুঁটিয়ে দেখা রপ্ত করছো তো তোমরা ? প্রয়োজনে মা / বাবা বা অন্যদেরও সাহায্য নিতে পার।

আর মাছ। কত রকম মাছ আমরা খাই বা দেখি। কেউ ছোট, কেউ বড়। পাখীদের মত কেউ কেউ আবার এক জায়গায় যায় আর পরে ফিরে আসে — কেউ আবার ফেরে না। মাছ দেখে বোঝা যায় কে কেমন গভীরে থাকে। তেমন করে দেখেছি কি ? কারা লোনা জলে থাকে আর কারা মিষ্টি জলে তা জানি তো ? পিঁপড়েদের মত দল বেঁধে চলার সময় এরাও ফোরোমেন এর মত কিছু ব্যবহার করছে কি ? এসো এখন থেকে এসব ও খুঁটিয়ে দেখি, জানি।

তেমনি আসতে পারে পাখীদের কথা। ক'টা পাখী চিনি আমরা ? দশ বারোটার বেশী অনেকেই না, বড়জোর বিশটা। ডাহুক চিনি, জলপিপি চিনি কি ? টিয়া চিনি, কিন্তু চন্দনা ? কতরকম বুলবুলি আছে জানি ? আর ঘু ঘু ? অন্ততঃ চার রকমের বুলবুলি তো দেখাই যায় আশপাশে। মুরগী চিনি কিন্তু বটের ? তোছা তাকা লা,া তকে. তিৎালে কথা বলে ? শব্দ শুনে বোঝা যায় কি ভাষার মূল বক্তব্য ? ভয় পেয়ে চড়াইরা যে শব্দ করে তা যে 'ভয়সূচক' তাকি সত্যিই বোঝা যায় না ! কত রকমারি তাদের বাসা। কত বিভিন্নতা তাদের আচরণে। পরিযায়ী পাখীরা কেন আসে শীতে, কিভাবে পথ চেনে। বাতাসের কি প্রভাব থাকে তাদের চলনে তা কি ভেবেছি কোন দিন ? ভাবিয়েছি কাউকে ?

প্রতি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গেই প্রকৃতি সাজে নতুন নতুন রূপে। ভিন্ন ফুল, ভিন্ন ফল, ভিন্ন সব্জী, ভিন্ন রূপ আকাশের, তাপমাত্রার ভিন্ন চরিত্র, আর বাতাসের ভিন্ন গতি। এই ভিন্নতার রূপ আস্বাদন করতে শিখতে হবে। চিনতে হবে আকাশকে। প্রায় প্রতিদিনই তো দেখি চাঁদ, কিন্তু শুধু চাঁদটা দেখেই বলতে পারবো কি সেটা শুক্লপক্ষের না কৃষ্ণপক্ষের ? চিনি হয়তো ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ। তিনি কি কৃত্তিকা, মৃগশিরা কিংবা অভিজিৎ ? এই চেনার মধ্য দিয়েই বাড়বে অনুসন্ধিৎসা, স্বচ্ছ হবে চেতনা, জড় ও জীব জগতের একাত্মতার রূপটিও হবে পরিষ্কার। পরে বড় সহয়ে সমাজের নানা ঘটনা, উপাদানকেও গভীরে গিয়ে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে উঠবে।

অনেক কথা বলে ফেললাম, তাই না ? কেমন লাগছে সবুজপাতা ? লিখতে, লেখা পাঠাতে ভুলো না যেন। আজ তাহলে এই অব্দি। ভালো থেকো সবাই।

তোমাদের

অমিদা

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

পরমা ঘোষমজুমদার

অনেকদিন ধরেই তোড়জোড় চলছিল কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ হয়ে উঠছিল না। হয় বৃষ্টি, না হয় পরীক্ষা এসব বাধা এসে জড়ো হচ্ছিল। অবশেষে তিরিশে নভেম্বর চাঁপা পুকুরে প্রকৃতির পাঠের উদ্দেশ্যে যাওয়া ঠিক হলো। সকাল সাড়ে ছ'টায় আমরা ছোট বড়ো প্রকৃতি পড়ুয়ারা সবাই শেয়ালদহ স্টেশনে, সেখান থেকে বারাসাত হয়ে চাঁপা পুকুরে এসে পৌঁছলাম।

আমরা যখন চাঁপাপুকুর দিয়ে চলেছি বেয়ারফুট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে তখন দেখি আশেপাশের লোকেরা আমাদের দিকে অবাক চোখে দেখছে। আমরা রঙ বেরঙের গাছপালা, প্রজাপতি, ফুল ও নানারকম পাখী দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অজানা জিনিষের সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সঙ্গে যা কিছু শুকনো খাবার দাবার ছিলো সেগুলো সাবাড় করে ফেল্লাম।

আমাদের এবার এক জন বড়ো প্রকৃতি পড়ুয়া দাদা বা দিদির সঙ্গে একজন ছোটো প্রকৃতি পড়ুয়া নিয়ে এক একটা দল ভাগ হলো।

আমাদের দলে দু'জন দাদা। জয়ন্ত দা ও কুণালদা আমি আর মৌলী ছিলাম। আমরা চলতে চলতে একটা শ্যাওলা জমা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে একটা পাতা ঝরা অশ্বত্থ গাছের উপরে দেখতে পেলাম একটা পাখীকে। যার সারাগা সবুজ। আর মাথার কাছটা লাল, চোখের কাছে লম্বা কালো দাগ যেন কাজল পরেছে। দাদারা চিনিয়ে দিলেন এর নাম 'বাঁশ পাতি' আর উল্টোদিকে দেখি আরেকটা গাছের ডালে পুরোপুরি কালো একটা পাখী। তার লেজের দিকটা চেরা এর নাম ফিঙে। গাছটায় চড়তে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের গাইডরা বললেন পরে ফেরার পথে। আমরা অনেক কিছু জানলাম। যেমন কলা গাছের পাতাগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে যায়। একরকম মাটি যাতে মাটির থেকে বালির ভাগ বেশী, (বেলে মাটি)। হলুদ চাষ ও মূলোর চাষ দেখলাম। তারপর আমরা ধান ক্ষেত ধরে এগিয়ে গেলাম। সেখানে অন্যসব দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেখানে একটা ছোট ডোবার মধ্যে সবুজ সবুজ ব্যাঙ দেখলাম। আমরা অনেক কিছু সংগ্রহ করলাম যেমন ধানের শিষ, কাঁচা হলুদ, শামুক, এমনকি সাপের খোলসও।

এরপর আবার আমরা আমাদের পুরনো জায়গায় ফিরে এলাম। এখানে এসে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে যার যার অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেললাম।

তারপর আমাদের খাওয়ার ডাক এলো। খাওয়ার ব্যাপারটা খুবই মজার। খাবার ঘরে সিমেন্টের ছোট ছোট চেয়ারও টেবিল পাতা। নিজেদের থালা নিজেরা ধুয়ে এনে খাবার নিয়ে খেতে বসে গেলাম। ঝোল, তরকারী, ভাত, মাছ অমৃতের মতো খেতে লাগছিল। খাওয়া শেষে থালা ধুয়ে জায়গায় রেখে এলাম। আবার আমরা আলোচনা গৃহে চলে এলাম। এখানে এসে একটা Camp Fire এর মতো অনুষ্ঠান হলো। স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমাণ্য লোক ছিলেন যারা আমাদের খুব সাহায্য করেছেন। তাঁরা আমাদের গ্রামের অনেক কথা জানালেন। আমরাও যার যার অভিজ্ঞতার কথা পড়ে শোনালাম। এরপর সারাদিনের সুন্দর স্মৃতি নিয়ে চাঁপাপুকুরকে বিদায় জানিয়ে ট্রেন ধরার জন্যে দ্রুত পা চালালাম।

তোমাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ অনাদি নাথ দাঁ

প্রশ্ন ঃ বেতার অনুষ্ঠান প্রচারে নানা ধরনের তরঙ্গ, যেমন মিডিয়ম ওয়েভ্, শর্ট ওয়েভ্ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলির অর্থ কি এবং কখন কোন তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় ?

(উত্তরপাড়া, হুগলী থেকে প্রশ্নটি পাঠিয়েছে অর্ণব দে ও মৌটুসী দে)

উত্তর ঃ মিডিয়ম ওয়েভ্, শর্ট ওয়েভ্, ইত্যাদি কথাগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ বোঝায়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ১০০০ মিটারের মধ্যে হলে তাদের মিডিয়ম ওয়েভ্ বা মধ্যম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বলা হয়। শর্ট ওয়েভ বা হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে হয়।

মিডিয়ম ওয়েভ তরঙ্গ সচরাচর কাছে পিঠে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই তরঙ্গগুলি প্রধানত ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর অর্থাৎ মাটি ঘেঁষা পথে পরিভ্রমণ করে। ভূপৃষ্ঠের শোষণের ফলে এই মাটি ঘেঁষা তরঙ্গের শক্তি কমে যায় ও সেগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হয়, এই শক্তি হ্রাসও তত বেশী হয়। এই কারণে বেশী দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, ইংরাজীতে যাদের লং ওয়েভ বলা হয় (যাদের দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটারেরও বেশী), সেগুলি মিডিয়ম ওয়েভের তুলনায় বেশী দূর যেতে পারে। কিন্তু লং ওয়েভ পাঠানোর জন্য যে এরিয়েলের প্রয়োজন, তা এত ব্যয়সাধ্য ও বৃহৎ আকারের হয় যে সাধারণভাবে লং ওয়েভের চেয়ে মিডিয়ম ওয়েভের প্রচলন বেশী। লং ও মিডিয়ম ওয়েভের সুবিধা এই যে দিনে বা রাতে অথবা ঋতু পরিবর্তনের সাথে এদের শক্তির বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

এবার শর্ট ওয়েভের কথায় আসা যাক। এই ধরনের তরঙ্গ দূর পাল্লায় বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট বলে মাটি ঘেঁষা পথে এদের শক্তি খুবই দ্রুত শোষিত হয়ে যায়। কিন্তু আকাশ পথে আয়ন মণ্ডল মারফৎ এই তরঙ্গ দূর দূরান্তে অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সূর্য থেকে নির্গত অতি বেগুনী ও এক্স রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় পদার্থগুলি থেকে কিছু ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে আকাশে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নযুক্ত অণু পরমাণু সমন্বিত একাধিক অঞ্চল বা স্তরের সৃষ্টি করে। এই স্তরগুলিকে আয়ন মণ্ডল বলে। আয়ন মণ্ডলের উচ্চতা ভূপৃষ্ঠের উপর ৮০ থেকে ৬৫০ কিলোমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে। বেতার তরঙ্গ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হওয়ার কারণে যখন আকাশ পথে আয়নস্তরগুলির সংস্পর্শে আসে, তখন এই স্তরগুলির বিদ্যুৎ পরিবাহীতার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বগামী তরঙ্গের গতিপথ পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে বেঁকতে শুরু করে এবং যে তরঙ্গ প্রথমে আকাশমুখী ছিল, তা উপযুক্ত পরিবেশে পুনরায় পৃথিবীমুখী হয়ে যায়। এই ভাবেই শর্ট ওয়েভের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের একস্থান থেকে দূরবর্তী যে কোন স্থানে বেতার সংকেত পাঠানো সম্ভব হয়।

একই দৈর্ঘ্যের শর্ট ওয়েভ কিন্তু দিনের বিভিন্ন সময়ে বা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহার করা যায় না। এর কারণ এই যে দিনের বেলায় সূর্যের উপস্থিতির জন্য আয়নমণ্ডলে আয়ন সৃষ্টির কাজ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে আয়ন স্তরের মধ্যে তরঙ্গের শোষণও বেশী হয়। এই শোষণের পরিমাণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে —

দৈর্ঘ্য যত বেশী, শোষণও তত বেশী। সেই কারণে রাতের তুলনায় দিনের বেলায় হ্রস্বতর দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যাতে তরঙ্গের শোষণ কম হয় এবং তার শক্তি বিশেষ হ্রাস না পায়। এই একই কারণে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, কেন না শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে আয়নস্তরগুলি অনেক কম উচ্চতায় তৈরী হয় এবং তাদের তড়িৎ ঘনত্বও থাকে বেশী। ফলে তাদের শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময় বেতার তরঙ্গকে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তে তার কম্পাঙ্ক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হয়, তার কম্পাংক তত বেশী হয়। ত্রি কোটি সংখ্যাটিকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (মিটার এককে) দিয়ে ভাগ করলে তরঙ্গের কম্পাংক পাওয়া যায়। যেমন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি ৩০০ মিটার হয়, তবে কম্পাংক হবে ৩০ × $১০^{৭}$ ÷ ৩০০ = $১০^{৬}$ বা ১০ লক্ষ হার্ৎজ বা ১ মেগাহার্ৎজ্। হার্ৎজ্ কথাটি হল কম্পাংকের একক।

ছড়ানো ছেটানো ছড়া

গরমের ছুটি

বাদল মান্না (১০)

আম-জাম-জামরুল
সপেদা, কাঁঠাল
লিচু ও খেজুর সাথে
শাঁসে ভরা তাল
পাকা পেঁপে, তরমুজ
আর শশা, ফুটি
খেতে খেতে কেটে যাবে
গরমের ছুটি।

উপেন্দ্রনাথ

মেঘলা নন্দী (১২)

তিনি শ্রীযুত ব্রহ্মচারী উপেন্দ্রনাথ
কালাজ্বর তার কাছে কুপোকাৎ।
তারই তৈরী ইউরিয়া স্টিবামাইন
রোগটি সারাতে অব্যর্থ ও ফাইন।।
মহামারী হয়ে এরোগ আসতো আগে
এখনো সেদিন স্বপ্নে বুঝি বা জাগে।
কালাজ্বর গেছে, আছে উপেন্দ্রনাথ
ভরসায় কাটে আমাদের দিন রাত।।

চাচা চাইচিং

তিয়াস দত্ত (১৫)

মঙ্গলে গিয়েছিল চড়ে যান ভাইকিং
রিমি, টুবু, বাণ্টি ও চাচা শের চাইচিং
ফিরে চাচা হতবাক
চুল ভরা ফুল টাক
চাচী বলে মস্করা নট মাই লাইকিং

খেলতে খেলতে . . . . . .

অমিত মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট বন্ধুরা, এখন আমি তোমাদের কয়েকটি নতুন খেলার কথা জানাব। কী খুশীতো ? আমরা তো কতরকম খেলাই জানি, কোনটি ঘরে বসে খেলতে হয়, কোনটি আবার মাঠে খেলতে হয়। তবে খেলা যেরকমই হোক না কেন অনেকজনে মিলে খেললে তবেই মজা। আমার খেলাটিও অনেক জনে মিলে খেলতে হয়। পাঁচজন হলেই খেলা শুরু করা যায়। তবে যতবেশী খেলোয়াড় হবে ততই মজা পাওয়া যাবে। এই খেলাটির নাম 'আমরা ভারতীয়'। এই খেলায় সাদা কাগজ, কলম আর একটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ম্যাপ লাগবে।

কী করে খেলব ?

মাটিতে বসে বা টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসতে হবে। এরপর যে কোন একজন থেকে শুরু করে তার ডান দিক অথবা বাঁ দিক ধরে পর পর ১ - ২ - ৩ এইভাবে নিজেদের ক্রমিক সংখ্যা ঠিক করে নিতে হবে। এইবার নীচের নমুনা মত কাগজে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে হবে, আর কাগজের ডান দিকের কোনায় নিজের ক্রমিক সংখ্যা লিখতে হবে। এই কাগজটিকে আমরা বলব ১ম/মূল কাগজ

(১)

অমিত মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
১২, নম্বর বি বা দী বাগ
কলিকাতা-৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ

এইভাবে সবাই (কমপক্ষে ৫ জন) নিজের নাম ঠিকানা ও ক্রমিক সংখ্যা লেখার পরে আরও কয়েকটি লম্বা ফালি কাগজ নিতে হবে। এখন এই কাগজগুলোতে নমুনা মত মূল/১ম কাগজে লেখা বিভিন্ন তথ্য আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে। প্রত্যেক কাগজে অবশ্যই নিজের ক্রমিক সংখ্যা লিখতে হবে।

২য় কাগজ — (১) অমিত মুখোপাধ্যায়

৩য় কাগজ — (১) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

৪র্থ কাগজ — (১) ১২ নম্বর বি বা দী বাগ

৫ম কাগজ — (১) কলিকাতা-৭০০ ০০১

৬ষ্ঠ কাগজ — (১) পশ্চিমবঙ্গ

৭ম কাগজ — (১) ভারত

এইভাবে প্রত্যেকের কাগজ লেখা শেষ হলে, মূল/১ম কাগজ বাদ দিয়ে প্রত্যেকের আর সব ফালি কাগজ (২য় থেকে ৭ম) একসঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন, একই লেখা আছে এমন কটি কাগজ আমরা পেতে পারি ? উত্তর পাবার জন্য একই রকম লেখা আছে এমন কাগজগুলো এক জায়গায় রেখে দেখ তোমার

উত্তরের সঙ্গে মিলল কিনা। নিশ্চয় 'ভারত' (৭ম কাগজ) লেখা কাগজটির সংখ্যা আর খেলওয়াড়ের সংখ্যা এক হবে। তবে কোন কোন সময় এইরকম নাও হতে পারে, কখন হবে বলত ? যদি স্কুলের বন্ধুরা খেল তবে আর কোন কোন কাগজ এক হবে ? কোন্ কাগজের লেখা পরস্পর কখনই এক হবে না ? উত্তরগুলো আমাদের পত্রিকার দপ্তরে লিখে জানাও। তবে উত্তর পাঠাবার আগে অবশ্যই নিজেরা খেলে, খেলার ফলের সঙ্গে মিলিয়ে তবে পাঠাবে।

এই খেলাটি খেলার সব থেকে ভাল উপায় হল একজন খেলাটি ভাল করে পড়ে নিয়ে অন্যদের নিয়ে খেলবে আর ধাপে ধাপে খেলার পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্ন করবে আর উত্তর মেলাবে।

প্রথমবার এইভাবে খেলার পরে ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক ম্যাপ সামনে রেখে, পেনসিল দিয়ে ভারতবর্ষকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চল এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে হবে। এখন নিজেদের কে ঐ পাঁচটা অঞ্চলের অধিবাসী ধরে নিয়ে খেলাটি খেলতে হবে। এক্ষেত্রে ওই পাঁচটি অঞ্চলের ঠিকানা জানা থাকলে ভাল হয়। যদি ঠিকানা অজানা থাকে তাহলে ঐ সব অঞ্চলের শহরের নাম ঠিক করে ঠিকানা তৈরী করে নিতে হবে। যদি খেলোয়াড় বেশি হয় তখন রাজ্য ধরে ধরে নিজেদের চিহ্নিত করে খেলতে হবে।

এখন বলতো তোমাদের পরিবারের লোক সংখ্যা কত ? তাদের প্রত্যেকের নাম কী এক ? নিশ্চয় নয়, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমরা কোন বাড়ি/পরিবারের মানুষ" ? উত্তরটি এক হবে না আলাদা হবে ? এই ভাবে যদি আমরা পাড়া, গ্রাম/শহর, জেলা রাজ্য ধরে প্রশ্ন করতে থাকি তবে কি দেখা যাবে ?যেমন মনে কর তোমরা সারা দেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে কয়েকজন বিদেশে গেছ, তখন তোমাদের প্রথম পরিচয় কী হবে ? বা তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছ ? তখন তোমরা কী উত্তর দেবে বলত ? উত্তর নিশ্চয় হবে 'ভারত'। আমরা ভারতের যে অঞ্চলেই বাস করি না কেন আমাদের প্রথম পরিচয় , আমরা ভারতীয়। ঠিক যেমন আমাদের পরিবারে প্রত্যেকের নাম বিভিন্ন হলেও আমাদের ঠিকানা বা পারিবারিক পরিচয় কিন্তু একই রকম।

আমাদের ১ম খেলা শেষ হল। এই পর্যায়ে আরও কিছু খেলা আছে, সবকটি খেলা মিলে একটি বড় খেলা শেখা যাবে। পরবর্তী খেলা আগামী সংখ্যায় পাওয়া যাবে।

গত সংখ্যার শব্দ সিঁড়ির সমাধান

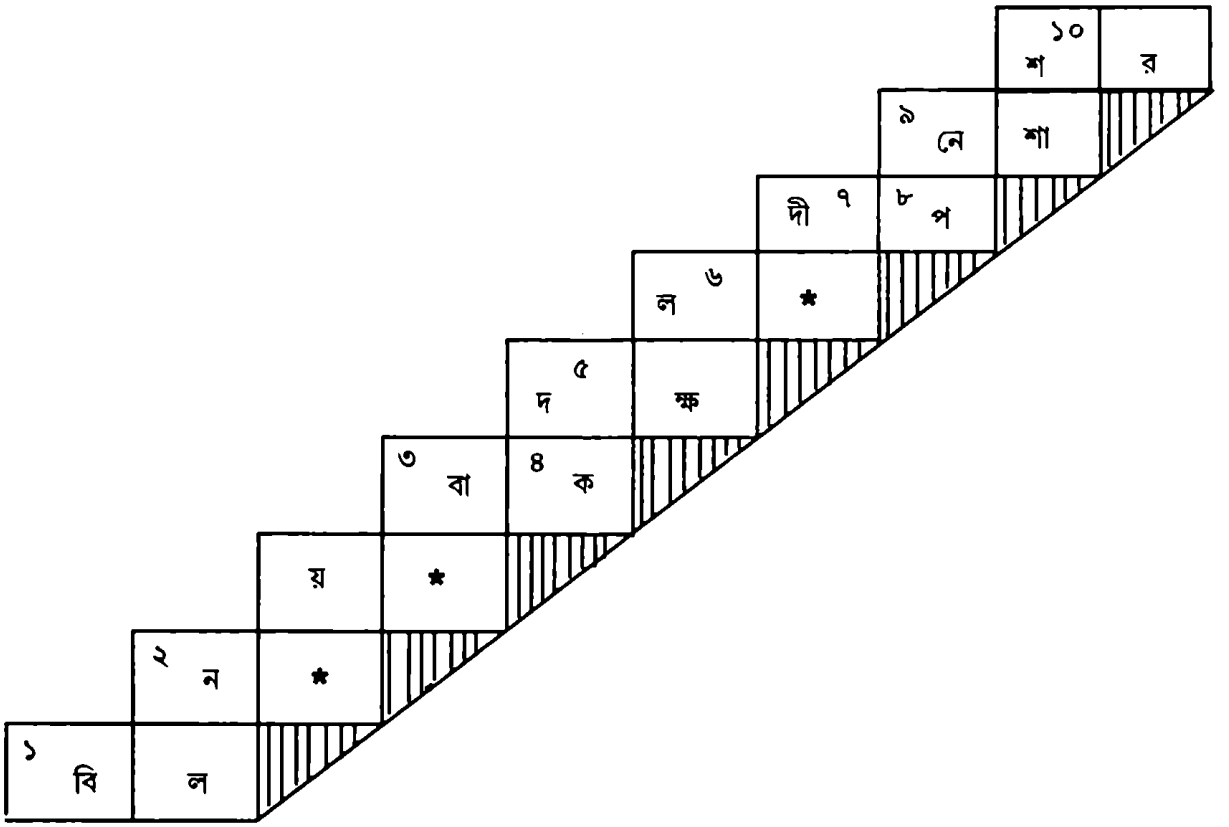

এবারের শব্দ সিঁড়ি

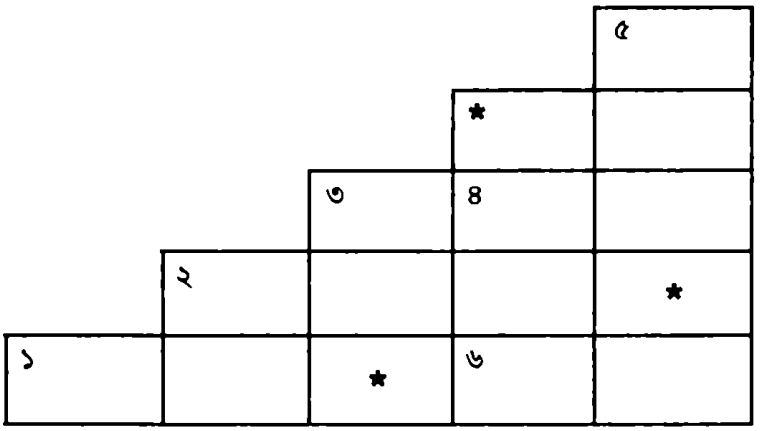

আ মা দে র ব ই

জীবনের জন্য বিজ্ঞান	ঃ	একটি সংকলন	২.০০
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা	ঃ	উজ্জ্বল মুখার্জী, অধৃষ্য কুমার	৩.০০
বিজ্ঞান নাটিকা	ঃ	একটি সংকলন	৮.০০
বরণীয় বিজ্ঞানী	ঃ	শ্যামল চক্রবর্তী	৬.০০
কম খরচে দরকারী খাবার	ঃ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৬.০০
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য	ঃ	সুখময় ভট্টাচার্য	৩.০০
পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, ১৯৯৫	ঃ	অলকমোহন চট্টোপাধ্যায়	৭.০০
বিজ্ঞান কি ?	ঃ	বিনোদ রায়না অনুঃ অভিজিৎ মজুমদার	৩.০০
এই আমাদের বসুন্ধরা	ঃ	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৬.০০
শিশু যখন কিশোর হল	ঃ	অমিয় কুমার হাটি	৬.০০
শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে	ঃ	মানস সান্যাল	৩.০০
সন তারিখ হপ্তা মাস	ঃ	প্রদীপ্ত সেন	৬.০০
সমাজ বিজ্ঞান ও জে. ডি. বার্নাল	ঃ	একটি সংকলন	৮.০০
পাখির কাহিনী	ঃ	জীবন সর্দার	৬.০০
বিজ্ঞানের মজার খেলা	ঃ	অপরাজিত বসু	১০.০০
সমাজ শরীর অসুখ	ঃ	তুষার কান্তি বটব্যাল	৮০.০০
জল মাটি বাতাস	ঃ	জ্যোতির্ময় দত্ত	৪.০০
ভারতের স্বনির্ভরতা ও ডাঙ্কেল প্রস্তাব	ঃ	অংশতোষ খাঁ, গৌতম রায়	৫.০০
বিজ্ঞানের নাটক বিজ্ঞানের গান	ঃ	একটি সংকলন	৩০.০০
চেনা অচেনা মজার পশু	ঃ	স্বপন কুমার শূর	৫.০০
স্বভাব বিজ্ঞানী	ঃ	রণতোষ চক্রবর্তী	২৫.০০
ডিমের অজানা জগৎ	ঃ	রতনলাল ব্রহ্মচারী	২৫.০০
আকাশের কথা	ঃ	শংকর চক্রবর্তী	১৮.০০
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ	ঃ	শংকর চক্রবর্তী	১.০০
জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষবিদ্যা	ঃ	অলকমোহন চট্টোপাধ্যায়	৮.০০
এবারের সূর্য গ্রহণ ঃ আমরা কি পেলাম	ঃ	অপরাজিত বসু, শ্যামল চক্রবর্তী ও অরুণাভ মিশ্র	৬.০০
বাংলা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চা	ঃ	দীপক ভট্টাচার্য	৮.০০
জগৎসভায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র	ঃ	দিবাকর সেন	২০.০০
মৌলবাদ ও বিজ্ঞান	ঃ	একটি সংকলন	৬.০০
পরিবেশ কথা	ঃ	একটি সংকলন	১০.০০
মানুষের জন্য বিজ্ঞান সমাজের জন্য বিজ্ঞান	ঃ	শ্রীদীপ ভট্টাচার্য	৩.০০
পরিবেশ প্রাকৃতিক সম্পদও দূষণের সঙ্কট	ঃ	তপন সাহা	৮.০০
আন্ত্রিক	ঃ	কুন্তল বিশ্বাস	৫.০০
Biotechnology and Bioethics	:	Rathindranarayan Basu	100.00
In Search of National Mineral Policy	:	A collection of articles	40.00

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

'হেমন্ত বসু ভবন' (৪র্থ তল)

১২, বি. বা. দি. বাগ

কলকাতা — ৭০০ ০০১